রাই-কমল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

শ্রীমতী উমা দেবী

কল্যাণীয়াসু

লাভপুর
বীরভূম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের

ইহার পূর্ব্বে 'রাই-কমল' দুইবার ছাপা হইয়াছে। এবার মুদ্রণের সময় হঠাৎ হাতে পড়িল—'রাই-কমলে'র মূল গল্প দুইটি, 'কল্লোলে' প্রকাশিত প্রথম অংশ "রাই-কমল" ও 'উপাসনা'য় প্রকাশিত দ্বিতীয় অংশ "মালা-চন্দন"। মিলাইয়া দেখিতে চোখে পড়িল, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কতক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাদ অবশ্য আমিই দিয়াছিলাম সেকালে। একালে তাহার কতক অংশ নিজের খুব ভাল লাগিল। সেই অংশটুকু যোগ করিয়া দিলাম, এবং মূল রূপের পরিবর্ত্তন যখন হইলই তখন প্রথম দিকে—বৈষ্ণব সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র রাঢ় দেশের কেন্দুবিল্ব এবং নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী অজয়ের তীরভূমির কিছু পরিচয় প্রয়োজনবোধে যোগ করিয়া দিলাম। চালচিত্র না হইলে প্রতিমা মানায় না; স্থান ও কালের পটভূমি উপযোগী না হইলে পাত্র-পাত্রীর পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। পাঠকেরও বুঝিতেও কষ্ট হয়।

'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রথম প্রকাশিত হইলেও—রচনা হিসাবে 'রাই-কমল'ই আমার প্রথম উপন্যাস। তাই তৃতীয় বার মুদ্রণের সময় একটু বিশেষ যত্ন লইতে ইচ্ছা হইল। স্নেহাস্পদ শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন। প্রীতিভাজন সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুফ দেখিয়াছেন। পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত অজিতকুমার গুপ্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত বইখানির ব্লক নির্ম্মাণ ও কভার ছাপিয়া বইখানিকে সজ্জিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

ভাদ্র ১৩৫২
লাভপুর, বীরভূম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

পশ্চিম বাংলার রাঢ় দেশ।

এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব-কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থল পর্য্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই'। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু' হইয়াছিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল যেদিন, সেদিনের অনেককাল পূর্ব্ব হইতেই এ অঞ্চলটিতে মানুষেরা "ধীর সমীরে যমুনাতীরে" যে বাঁশী বাজে, তাহার ধ্বনি শুনিয়াছিল। এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন-ফাঁদে শ্যাম-শুকপাখি ধরিয়া হৃদয়-পিঞ্জরে প্রেমের শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে জানিত। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষে জানিত, 'সুখ দুখ দুটি ভাই', 'সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই'।

লোকে কপালে তিলক কাটিত, গলায় তুলসীকাঠের মালা ধারণ করিত; আজও সে তিলক-মালা তাহাদের আছে। পুরুষেরা শিখা রাখিত, আজও রাখে; মেয়েরা চূড়া করিয়া চুল বাঁধিত। এখন নানা ধরনের খোঁপা বাঁধার রেওয়াজ হইয়াছে, কিন্তু স্নানের পর এখনও মেয়েরা দিনান্তে একবারও চূড়া করিয়া চুল বাঁধে। রাত্রে বাঁশের বাঁশীর সুর শুনিলে এ অঞ্চলের এক-সন্তানের জননী যাহারা, তাহারা আর জলগ্রহণ করে না। মনে পড়ে পুত্রবিরহবিধুরা যশোদার কথা। হলুদমনি পাখি—বাংলা

দেশের অন্যত্র তাহারা 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে, এখানে আসিয়া তাহারা সে ডাক ভুলিয়া যায়, 'কৃষ্ণ কোথা গো' বলিয়া ডাকে।

অধিকাংশই চাষীর গ্রাম। দশ-বিশখানা গ্রামের পরে দুই-একখানা ব্রাহ্মণ এবং ভদ্র সম্প্রদায়ের গ্রাম পাওয়া যায়। চাষীর গ্রামে সদ্‌গোপেরাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই মালা তিলক ধারণ করে, হাতজোড় করিয়া কথা বলে, প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারীরা 'রাধে-কৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়; বৈষ্ণবেরা খোল করতাল লইয়া আসে; বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একতারা খঞ্জনী লইয়া গান গায়; বাউলেরা একা আসে একতারা বাজাইয়া। মুসলমান ফকিরেরা পর্য্যন্ত বেহালা লইয়া গান গায়—পুত্রশোকাতুরা যশোদার খেদের গান। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব-আখড়ায় পদাবলী গান হয়, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সংকীর্ত্তন হয়, ঘরের খ'ড়ো বারান্দায় ঝুলানো এদেশী শালিক পাখি 'রা-ধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রা-ধা, গো-পী ভজ' বলিয়া ডাকে। লোকে শখ করিয়া মালতী মাধবী ফুলের চারা লাগায়। প্রতি পুকুরের পাড়েই কদমগাছ আছে। কদমগাছ নাকি লাগাইতে হয়। বর্ষায় কদম্বগাছগুলি ফুলে ভরিয়া উঠে, সেই দিকে চাহিয়া প্রবীনেরা অকারণে কাঁদে।

সে কাল আর নাই। লোকের সে স্বাস্থ্য নাই, রোগ আসিয়া ঢুকিয়াছে, শোকও অনেক, দুঃখও বাড়িয়াছে, গোলার ধান ফুরাইয়াছে, গোয়ালের গাই কমিয়াছে, তবুও মানুষ এই

ধারাটি ভুলিয়া যায় নাই; 'হরি বলতে নয়ন ঝরে'—তাদের দু ভাইকে স্মরণ করিয়া তাহারা কাঁদে। 'সুখ দুখ দুটি ভাই' এই তত্ত্বটি তাহাদের কাছে অতি সহজ কথা। 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে'—আজও সেখানে বাঁশী বাজে।

এই অঞ্চলে চাষীদের ছোট একখানি গ্রাম। মাটির ঘর, মেটে পথ, পথের দুই ধারে পতিত জায়গায় ভাঁটিফুল ফোটে, কস্তুরীফুল ফোটে, নয়নতারার লাল সাদা ফুল চাপ বাঁধিয়া ফুটিয়া থাকে, অজস্র 'বাবুরি'গাছের জঙ্গল হইতে তুলসীর গন্ধ উঠে। ছোট ছোট ডোবায় মেয়েরা বাসন মাজে, কাপড় কাচে। পাড়ের উপরে বাঁশবনে সকরুণ শব্দ উঠে, কদম, শিরীষ, বকুল, অর্জ্জুন, আম, জাম, কাঁঠাল-বনে পাখি ডাকে। চাষীরা মাঠে যায়। মেয়েরা ঘরের পাশে শাকের ক্ষেতে জল দেয়, লাউ-কুমড়া-লতার পরিচর্য্যা করে। ধান শুকায়, ধান তোলে, সিদ্ধ করে, ঢেঁকিতে ভানে। ছেলেরা সকালে কেউ পাঠশালায় যায়, কেউ যায় না, গরুর সেবা করে। গ্রামখানির উত্তর প্রান্তের ছোট্ট একটি বৈষ্ণবের আখড়া কাহিনীটির কেন্দ্রস্থল। সুনিবিড় ছায়াঘন কুঞ্জভবনের মত আখড়াটির নাম ছিল—হরিদাসের কুঞ্জ। হরিদাস মহান্ত ছিল আখড়াটির প্রতিষ্ঠাতা। আখড়াটির চারিদিক রাং-চিতার বেড়া দিয়া ঘেরা। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে আম, জাম, পেয়ারা, নিম, সজিনা গাছের ঘন পল্লবের প্রসন্ন ছায়া আখড়াটির সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া আছে নিবিড় মমতার মত। পিছনের দিকে কয় ঝাড় বাঁশ যেন দুলিয়া দুলিয়া আকাশের

সঙ্গে কথা কয়। এই আবেষ্টনীর মধ্যে দুই পাশে দুইখানি মেটে ঘর আর তাহারই কোলে রাঙা মাটি দিয়া নিকানো ছোট্ট একটি আঙিনা সর্ব্বদা সুপরিচ্ছন্ন মার্জ্জনায় তকতক করে। লোকে বলে, সিঁদুর পড়িলেও তোলা যায়। ঠিক মাঝ-আঙিনায় একটি চারা-গাছে জড়াজড়ি করিয়া উঠিয়াছে দুইটি ফুলের লতা—একটি মালতী, অপরটি মাধবী। শক্ত বাঁশের মাচার উপরে লতা দুইটি লতাইয়া বেড়ায় আর পালাপালি করিয়া ফুল ফোটায় প্রায় গোটা বছর। লতা-বিতানটির নিবিড় পল্লবদলের মধ্যে অসংখ্য মধুকুলকুলির বাসা। ছোট ছোট পাখিগুলি ফুলে ফুলে মধু খায় আর কলরব করে উদয়কাল হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত।

আখড়ায় থাকে মা ও মেয়ে—কামিনী ও কমলিনী। পল্লীবাসীরা দেশের ভাষা অনুযায়ী বলে 'মা-বিটীরা'। বৈষ্ণবের সংসার চলে ভিক্ষায়। কামিনী খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া আনে। কিশোরী মেয়ে কমলিনী ঘরে থাকে, গৃহকর্ম্ম করে, পাড়ায় সঙ্গী-সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলা করে, গুনগুন করিয়া গান গায়। গান শেখা এখনও তাহার শেষ হয় নাই। ভিক্ষায় বাহির হইবার বয়স হয় নাই। তবে গানের দিকে মেয়েটির একটি সহজ দখল ছিল। তাহার বাপ হরিদাস মহান্ত ছিল এ অঞ্চলে একজন প্রতিষ্ঠাবান গায়ক। কমলিনীর মা কামিনীর শিক্ষাও তাহারই কাছে।

কামিনীর গলা ছিল বড় মিঠা। হরিদাস ওই মিঠা গলার জন্যই শখ করিয়া তাহাকে গান শিখাইয়াছিল। কামিনী

সলজ্জভাবে আপত্তি করিলে সে বলিয়াছিল, জান, এসব হচ্ছে গোবিন্দের দান, এই রূপ এই কণ্ঠ এর অপব্যবহার করতে নাই। এতে তাঁরই পুজো করতে হয়। এই গলা তিনি তোমাকে দিয়েছেন এতে তাঁর নাম-গান হবে ব'লে।

তারপর আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিল, আরও শিখে রাখ কামিনী, আমার সম্পত্তির মধ্যে তো এইটুকু, ভালমন্দ কিছু হ'লে এ ভাঙিয়ে তুমি খেতে পারবে।

কথাটা যে অতি বড় নিষ্ঠুর সত্য, সেদিন তাহা কেহ ভাবে নাই। কিন্তু ভবিতব্যের চক্রান্তে পরিহাস সত্য হইল। সত্যই আজ কামিনীর ওই গানই সম্বল।

মা-বাপের উভয়ের এই গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে কমলিনীর ছিল। সঙ্গীতে যেন একটি স্বচ্ছন্দ অধিকার তাহার ছিল—একবার শুনিলেই গানের সুরখানি সে যেন আপন কণ্ঠে বসাইয়া লইত। মায়ের নিকট পাইয়াছিল সে সুস্বর—তরুণ কণ্ঠটি ছিল তাহার সরল বাঁশের বাঁশীর মত সুডৌল, মধুক্ষরা।

গৃহকর্ম্মের মধ্যে সে শাকসব্জি ও মালতী-মাধবীর জোড়া-লতার চারাটিতে জল দেয়। রাঙা মাটি দিয়া ঘর-দুয়ার ও আঙিনাটি পরিপাটী মার্জ্জনা করে আর হাসিয়া সারা হয়। চঞ্চলা মেয়েটির মুখে হাসি লাগিয়াই আছে।

আধবুড়া বাউল রসিকদাস কমলিনীকে গান শিখাইতে আসে। সে ডাকে—রাই-কমল।

কমলিনী অমনই হাসিয়া সারা, বলে, কি গো বগ-বাবাজী?

বাউল রসিকদাসের শরীরের গঠনভঙ্গী কেমন অতিরিক্ত লম্বা রকমের। বকের মত লম্বা গলা, অমনই লম্বা হাত-পা।

কমলিনীর তাহাকে দেখিলেই হাসি পায়। সে তাহার নাম দিয়াছে বগ-বাবাজী। রসিকদাস রাগ করে না, সে হাসে।

কমলিনী বলে, ম'রে যাই বগ-বাবাজীর শখ দেখে। দাড়িতে আবার বিনুনি পাকানো হয়েছে! পাকা চুলে মাথায় আবার রাখাল-চূড়ো। ওখানে একটি কাকের পাখা গোঁজ, ওগো ও বগ-বাবাজী!

বলিয়া আবার সে হাসে।

মা কামিনী রুষ্ট হইয়া উঠে—সে রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করে, মর মর মুখপুড়ী, চোদ্দ বছরের ধাড়ী—

রসিক হাসিয়া বাধা দিয়া বলে, না না, ব'কো না। ও আনন্দময়ী—রাই-কমল।

সায় পাইয়া কমলিনী জোর দিয়া বলে, বল তো বগ-বাবাজী।

বলিয়াই মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে এলাইয়া পড়ে।

ঝাঁট দিতে দিতে ঝাঁটাগাছটা উঁচাইয়া মা বলে, ফের! দেখবি?

বাহিরে বেড়ার ওপাশে পথের উপর হইতে মোড়লদের রঞ্জন ডাকে, কমলি! অমনই কমলি পলায়নের ভান করিয়া ছুটিতে শুরু করে। বলে, মার্, তোর নিজের মুখে মার্। থাকল তোর গান শেখা, চললাম আমি কুল খেতে।

রাগে গরগর করিতে করিতে মা বলে, বেরো—একেবারে বেরো।

মেয়ে মায়ের তিরস্কার আমলেই আনে না, চলিয়া যায়। মা পিছন পিছন বাহির-দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলে, কমলি, ফিরে আয় বলছি—ফিরে আয়। এত বড় মেয়ে, লোকে বলবে কি—সে জ্ঞান করিস ? বলি, ওলো ও কুলখাগী কমলি!

রসিকদাস হাসে। তাহার হাসি দেখিয়া কামিনীর অঙ্গ জ্বলিয়া যায়। সে ঝঙ্কার দিয়া বলে, কি যে হাস মহান্ত! তোমার হাসি আসছে তো!

রসিকদাস কোন উত্তর করে না। সে আপন মনে লম্বা দাড়িতে বিনুনি পাকায়। কামিনীও গৃহমার্জ্জনা করিতে করিতে কন্যাকেই তিরস্কার করে। গান শিখাইবার লোকের অভাবে রসিকদাস আপনার আখড়ার পথ ধরে। পথে নিজেই গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দেয়—

ফুটল রাই-কমলিনী বসল কৃষ্ণভ্রমর এসে।
লোকে বলে নানা কথা তাতে তার কি যায় আসে ?
কূল তো কমল চায় না বৃন্দে মাঝ-জলেই সে হাসে ভাসে।

রঞ্জন—মহেশ্বর মোড়লের ছেলে। কমলিনীর চেয়ে সে বৎসর তিন-চারেকের বড়। কমলিনীর সে খেলাঘরের বর—সে তাহার কিল মারিবার গোঁসাই। ধর্ম্মতলার প্রকাণ্ড বটগাছটার তলদেশটি এই গ্রামের ছেলেদের পুরুষানুক্রমিক খেলাঘর। গাছটিকে বেষ্টন করিয়া ছোট ছোট খেলাঘরে শিশু-কল্পনার গ্রাম এই

বসতিসৃষ্টির দিন হইতে নিত্যনিয়মিত গড়িয়া উঠিয়াছে। বট-গাছের উঁচু উঁচু শিকড়গুলি হইত তাহাদের তক্তাপোশ। পথের ধূলা গায়ে পায়ে স্বেচ্ছামত মাখিয়া বালক রঞ্জন আসিয়া সেই তক্তাপোশের উপর বসিয়া বিজ্ঞ চাষীর মত বলিত, বউ, ও বউ, একবার তামাক সাজ তো। আর খানিক বাতাস। আঃ, যে রোদ—আর চাষের যে খাটুনি!

কমলি তখন নয়-দশ বছরের। সে প্রগল্‌ভা বধূর মত ঝঙ্কার দিয়া উঠিত, আ ম'রে যাই! গরজ দেখে অঙ্গ আমার জুড়িয়ে গেল! আমার ব'লে কত কাজ বাকি, সেসব ফেলে আমি এখন তামাক সাজি, বাতাস করি! লবাব নাকি তুমি? তামাক নিজে সেজে খাও।

রঞ্জন হুঙ্কার দিয়া উঠিত, এই দেখ্—রোদে-পোড়া চাষা আর আগুনে তপ্ত ফাল এ দুইই সমান। বুঝে কথা বলিস কিন্তু। নইলে দোব তোর ধুমসো গতর ভেঙে।

অমনই কমলি খেলা ছাড়িয়া রঞ্জনের কাছে রোষভরে আগাইয়া আসিত। তাহার নাকের কাছে পিঠ উঁচাইয়া দিয়া বলিত, কই, দে—দে দেখি একবার। ওঃ—গতর ভেঙে দেবেন, ও রে আমার কে রে!

খেলাঘরের প্রতিবেশীর দল কৌতুকে খিলখিল করিয়া হাসিত। দারুণ অপমানে রুষিয়া রঞ্জন কমলির মোটা বিঁড়ে-খোঁপা ধরিয়া গদাগদ কিল বসাইয়া দিত। টান মারিয়া কমলি চুলের গোছা মুক্ত করিয়া লইত। কয়েকগাছা চুল রঞ্জনের

হাতেই থাকিয়া যাইত। তারপর ক্ষিপ্তার মত সে রঞ্জনের চোখে মুখে ধূলা ছিটাইয়া দিয়া রোষ-রোদনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিত, কেন, কেন, মারবি কেন তুই? আমাকে মারবার তুই কে?

ননদিনী কাতু প্রবীণার মত আসিয়া বলিত, এটি কিন্তু দাদা, তোমার ভারি অন্যায়।

ওপাড়ার ভোলা কমলির প্রতি দরদ দেখাইয়া বলিত, খেলতে এসে মারবি কেন রে রঞ্জন?

রঞ্জনের আর সহ্য হইত না। সে বলিত, নাঃ, মারবে না! পরিবারের মুখ-ঝামটা খেতে হবে নাকি সোয়ামী হয়ে?

কমলি ফুলিতে ফুলিতে গর্জ্জিয়া উঠিত, ওরে আমার সোয়ামী রে! বলে যে সেই, ভাত দেওয়ার ভাতার না, কিল মারবার গোঁসাই। যা যা, আমি তোর বউ হব না। তোর সঙ্গে আড়ি—আড়ি—আড়ি।

এমনই করিয়া সেদিন খেলা ভাঙিত। পরদিন প্রভাতে আবার সেখানে ছেলেদের কলরব জাগিয়া উঠিত। সেদিন প্রথমেই কমলির হাত ধরিত ভোলা। সে বলিত, আজ ভাই তোতে আমাতে, বেশ—

কমলি আড়চোখে তাকাইয়া দেখিত, ওপাশে রঞ্জন দাঁড়াইয়া আছে। মাঝের পাড়ার বৈষ্ণবদের মেয়ে পরী আগাইয়া আসিত। রঞ্জনের হাত ধরিয়া বলিত, তোতে আমাতে, বেশ ভাই রঞ্জন।

পরীও কমলির সমবয়সী ; কিন্তু কমলির সহিত তাহার যেন একটা শত্রুতা আছে। পরীদের বাড়ি রঞ্জনদের বাড়ির পাশেই। রঞ্জনকে লইয়া কমলির সঙ্গে তাহার খুনসুটি লাগিয়াই আছে। রঞ্জন বলিত, বেশ।

কমলি ভোলাকে বলিত, আমি ভাই বিধবা। একা খেলব।

দুই-তিন দিন পর একদিন পরীকে খেদাইয়া দিয়া রঞ্জন মাথা নাড়িয়া বলিত, বিয়েই আমি করব না।

ব্যঙ্গভরে ভোলা হাসিয়া বলিত, গোঁসাইঠাকুর গো!

ভোলার হাত ছাড়াইয়া কমলি অগ্রসর হইত। ভোলা বলিত, আবার মার খাবি কমলি?

কমলি বলিত, তা ভাই, মারে তো আর কি করব বল্? বর যখন ওকে একবার বলেছি, তখন ঘর ওর করতেই হবে? তা ব'লে তো দুবার বিয়ে হয় না মেয়ের! অ্যাঁ, না কি বল্ ভাই?—বলিয়া সে রঞ্জনের খেলাঘরে আসিয়া উঠিত। আসর জাঁকাইয়া বসিয়া সে ফরমাশ করিত পাকা গিন্নীটির মতই, আ আমার কপাল! নুন নাই, তেল নাই, বলি সেসব কি আমি রোজগার ক'রে আনব?

রঞ্জন কথা কহিত না, উদাসভাবে বসিয়া থাকিত। কমলি হাসিয়া বলিত ভোলাকে, সত্যি ভোলা, মোড়ল আমাদের গোঁসাই হয়েছেন। তারপর ফিসফিস করিয়া রঞ্জনের কাছে বলিত, কোন্ গোঁসাই গো? আমাকে কিল মারবার গোঁসাই নাকি?—বলিয়াই খিলখিল হাসি।

রঞ্জনও অমনই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিত। খেলার মধ্যে সকলের অগোচরে রঞ্জন ফিসফিস করিয়া বলিত, আর মারব না বউ, কালীর দিব্যি। কমলি আবার হাসিত।

এসব পুরানো কথা। কিন্তু সে কথা মনে করিয়া এখনও কমলি হাসে। রঞ্জন একটু যেন লজ্জা পায়, পাইবারই কথা। রঞ্জন আজ তরুণ কিশোর। তাহার চোখের কোণে কোণে আজ শীতান্তের নবকিশলয়ের মত লালিমাভা দেখা দিয়াছে। সরল কোমল দেহে পেশীগুলি পরিপুষ্টরূপে প্রকট হইয়া দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। আর সেই চপলা মুখরা কমলি আজ চোদ্দ বছরের কমলিনী। দেহে তার ফুল আজও ফুটে নাই, কিন্তু তাহার চঞ্চল চরণের ঈষৎ সঙ্কুচিত গতিতে, রঙের চিক্কণতায়, নয়নের চটুল ভঙ্গিমায়, গালের ফিকা লালিমাভায় মুকুলের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে। তবুও তাহার চাপল্যের অন্ত নাই। বয়সের ধর্ম্ম তাহার স্বভাব-ধর্ম্মের কাছে পরাজয় মানিয়াছে। এখন ঈষৎ চাপা চপল সে।

তাই কুলের ভয় দেখানো সত্ত্বেও সে রঞ্জনের সঙ্গে কুল খাইতে যায়, মায়ের ঝাঁটার ভয় উপেক্ষা করিয়াও রসিকদাসকে বলে 'বগ-বাবাজী'। সে চলিয়া যায়—চাপল্যে দেহে উঠে একটা হিল্লোল, নদীর নৃত্যপরা স্রোতের মত। কথা বলিতে কথার আগে উপচিয়া পড়ে হাসি, ঝরনাধারার ছলছল-ধ্বনির মত

সেদিন রঞ্জন গাছে চড়িয়া কুল ঝরাইতেছিল, তলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেগুলি কুড়াইয়া তুলিতেছিল কমলিনী। একটা কুলে কামড় মারিয়া কমলিনী বলিয়া উঠিল, আহা, কি মিষ্টি রে!

গাছের উপর হইতে ঝপ করিয়া রঞ্জন ঝাঁপ দিয়া মাটিতে পড়িয়া বলিল, দে, দে ভাই, আমাকে আধখানা দে।

আধ-খাওয়া কুলটা কমলি তাড়াতাড়ি রঞ্জনের মুখে পুরিয়া দিল। কুলটায় পোকা ধরিয়াছিল। বিস্বাদে রঞ্জন টাকরায় টোকা মারিয়া বলিল, বাবাঃ!

কমলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, কেমন রে?

রঞ্জন তখনও টোকা মারিতেছিল, সে বলিল, খুব মিষ্টি—তোর এঁটো যে।

হাততালি দিয়া কমলি হাসিতে হাসিতে বলিল, বোল হরিবোল! আমার মুখে চিনি আছে নাকি?

রঞ্জন বলিল, হুঁ, তুইই আমার চিনি।

কমলি হাসিয়া এলাইয়া পড়িল। তারপর বলিল, তোর এঁটো আমার কেমন লাগে জানিস?

কেমন?

ঝাল—ঠিক লঙ্কার মত। তুই আমার লঙ্কা।

বিষণ্ণভাবে রঞ্জন বলিল, যার যেমন ভালবাসা।

কমলি তাহার বিষণ্ণতা আমলেই আনিল না। কৌতুকভরে সে বাণের পর বাণ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছিল। বলিল,

তা তো হ'ল, কিন্তু তুই আমার এঁটো খেলি যে? তোর যে জাত গেল।

চকিতভাবে এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া রঞ্জন বলিল, কেউ তো দেখে নাই। তারপর সে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, গেল তো গেলই। ভেক নিয়ে আমি বোষ্টম হব। তোকে বিয়ে করব।

কমলি বলিয়া উঠিল, যাঃ, তোকে কে বিয়ে করবে? আকাট চাষা!

রঞ্জন খপ করিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, আমাকে বিয়ে করিস তো আমি জাত দিই কমলি।

কমলি বলিল, দূর, ছাড়্।

রঞ্জন বলিল, বল্—নইলে ছাড়ব না। কমলির হাতখানা সে আরও জোরে চাপিয়া ধরিল।

কাতরস্বরে কমলি বলিয়া উঠিল, উঃ—উঃ, ঘা—ঘা আছে। অপ্রস্তুত হইয়া রঞ্জন হাত ছাড়িয়া দিল। কমলির কলহাস্যে নির্জ্জনতার স্বপ্নভঙ্গ হইল। সে ছুটিয়া পলায়ন করিতে করিতে বলিয়া গেল, চাষার বুদ্ধির ধার কেমন? না, ভোঁতা লাঙলের ধার যেমন।

রঞ্জন অনুসরণ করিল না। সে পলায়নপরা কমলির গমন-পথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল—তাহাদের সাদা বলদটা কেমন করিয়া এখানে আসিল?

পিছন হইতে ডাক আসিল—হ-হ-হ। তাহার বাপ মহেশ্বর মোড়লের গলা। রঞ্জন মুহূর্ত্তে দৌড় দিল।

দুই

রঞ্জনের মা কমলিকে বড় ভালবাসিত। সে তাহার নাম দিয়াছিল—হাস্তময়ী। রঞ্জনকে দিতে গিয়া আধখানা মণ্ডা ভাঙিয়া সে কমলির হাতে দিত। কিন্তু সেদিন রঞ্জন যখন কমলির এঁটো কুল খাইয়া বাড়ি ফিরিল, তখন সে বলিল, রাক্ষুসী রাক্ষুসী, মায়াবিনী গো, ওরা ছত্রিশ-জেতে বোষ্টম—ওদের কাজই এই। মুড়োঝাঁটা মারি আমি হারামজাদীর মুখে।

কুল-খাওয়ার ঘটনাটা দৈবক্রমে খোদ মহেশ্বর মোড়লের—রঞ্জনের বাপের নজরে পড়িয়াছিল। মহেশ্বরের বলদটা অকারণে ছুটিয়া আসে নাই। গরু চরাইতে গিয়াছিল সে ওই কুলগাছটার পাশেই একটা জঙ্গলের আড়ালে। হঠাৎ ব্যাপারটা দেখিয়া অকারণে সে বলদটার পিঠে সজোরে পাচন-লাঠির এক ঘা বসাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। স্ত্রীর নিকট সে সমস্ত প্রকাশ না করিয়া পারিল না। রঞ্জনের মা গালে হাত দিয়া বিষম বিস্ময়ে লম্বা টানা সুরে বলিয়া উঠিল, ওগো মা, কোথায় যাব গো, জাত মান দুই গেল যে! রাক্ষুসী হারামজাদী কি নচ্ছার গো, মুড়োঝাঁটা মার মুখে। আর সে হারামজাদা গেল কোথা? ধ'রে গোবর খাওয়াও তুমি।

মহেশ্বর বাধা দিয়া বলিল, চুপ চুপ, চেঁচিয়ে গাঁগোল করিস না। জ্ঞাতিতে শুনলে টেনে ছাড়ানো দায় হবে, পতিত করবে। ধমক খাইয়া রঞ্জনের মা তখনকার মত চুপ করিল। কিন্তু রঞ্জন বাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র নথ নাড়িয়া, ঘন ঘন ভুরু তুলিয়া সে বলিল, বলি, ওরে ও মুখপোড়া, তোর রকম কি বল্ দেখি ?

রঞ্জনও সমানে তাল দিয়া বলিল, খেতে দাও বলছি। গাল খেয়ে পেট ভরবে না আমার। গাল খেতে আসি নাই আমি।

ঝঙ্কার দিয়া মা বলিয়া উঠিল, দোব—ছাই দোব মুখে তোমার। কমলির এঁটো কুল খেয়ে পেট ভরে নাই তোমার ? শরম-নাশা জাত-খেগো !

সাপের মাথায় যেন ঈশের মূল পড়িল। উদ্ধত রঞ্জনের রক্ত-চক্ষু নত হইয়া মাটির উপর নিবদ্ধ হইয়া গেল। মহেশ্বর মোড়ল আড়ালেই কোথায় ছিল। সে এবার সম্মুখে আসিয়া চাপা গলায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, হয়ে মরলি না কেন তুই ? মুখ হাসালি আমার তুই ! জাত নাশ করলি !

রঞ্জন নীরব হইয়া রহিল। তাহার নীরবতায় বাপের রাগ অকারণে বাড়িয়া গেল, সে বলিল, চুপ ক'রে আছিস যে ? কথার জবাব দে।

কিছুক্ষণ পর আবার সে গর্জ্জিয়া উঠিল, তবু কথার জবাব দেয় না ! আচ্ছা, আমিও তেমন লোক নই, তা জেনো তুমি। ত্যাজ্যপুত্তুর করব আমি তোমাকে—বাড়ি থেকে দূর ক'রে দোব। কিন্তু জাত আমি দোব না।

তারপর আদেশের সুরে বলিল, খবরদার, আর যাবে না ওদের বাড়ি। মা-বিটীদের ত্রিসীমেনা মাড়াবে না আর। এই ব'লে দিলাম তোমাকে—হ্যাঁ।

আস্ফালন করিয়া মহেশ্বর চলিয়া গেল। রঞ্জন নীরবে নত দৃষ্টিতে সেইখানেই বসিয়া রহিল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া মা আসিয়া এবার সান্ত্বনা দিয়া বলিল, মাঘ মাসেই বিয়ে দোব তোর। এমন বউ আনব, দেখবি, কমলি কোথায় লাগে!

রঞ্জন নীরবেই বসিয়া রহিল। মুড়ি বাহির করিতে করিতে মা ঘর হইতে বলিল, বলে যে সেই—

বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশী
রাই হেন কত মিলবে দাসী!

সুন্দর মেয়ের আবার ভাবনা!

রঞ্জন বলিয়া উঠিল, না।

মায়ের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। সবিস্ময়ে সে বলিল, কি না?

বিয়ে আমি করব না।

প্রবলতর বিস্ময়ে আশঙ্কায় মা প্রশ্ন করিয়া বসিল, কি করবি তবে?

রঞ্জন উঠিয়া পড়িল। আঙিনাটা অতিক্রম করিতে করিতে সে বলিয়া গেল, বোষ্টম হব আমি।

বিস্ময়ে হতবাক রঞ্জনের মা কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ পাইয়া ডাকিল স্বামীকে, ওগো মোড়ল, ও মোড়ল !

রঞ্জন আসিয়া উঠিল রসকুঞ্জে। রসিকদাসের আখড়ার ওই নাম। রসকুঞ্জ এ গ্রামের সকলেরই সুপরিচিত স্থান। ছেলেদের সেখানে মিলিত তামাক, বুড়োদের মিলিত গাঁজা। কাহারও মিলিত বিচিত্র আকারের বাঁশের হুঁকা, কাহারও বা সাপের মত আঁকাবাঁকা নল, কাহারও লতাবেষ্টনীর জোড়া ডালের ছড়ি, ঠিক যেন দুইটি সাপে পরস্পরকে জড়াইয়া আছে। এই রকম বহু উদ্ভট সুন্দর সামগ্রী আবিষ্কার করিয়া রসিকদাস সকলের মনোরঞ্জন করিত।

সেদিন রসিকদাস স্নানের পর দাড়ির বিন্যাস করিতেছিল, কাঁচাপাকা দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাইয়া ফাঁস ভাঙিতেছিল। রঞ্জন আসিয়া ডাকিল, মহান্ত !

রসিক বলিল, রাই-কমল-রঞ্জন যে হে ! এস এস।

রঞ্জনকে সে ওই নামে ডাকে। রঞ্জন অনেক কথা মনে মনে কাঁদিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সব কেমন গোলমাল হইয়া গেল। যেটুকু মনে ছিল, সেটুকুও লজ্জায় বলিতে পারিল না।

রসিকদাসই প্রশ্ন করিল, কি, তামাক খেতে হবে নাকি ? ভাত খেয়েছ ?

রঞ্জন একটা সুযোগ পাইল, সে বলিল, না। তোমার এখানেই খাব।

মহান্ত রসিকতা করিয়া বলিল, জাত যাবে যে হে !

ফস করিয়া রঞ্জন বলিয়া ফেলিল, বোষ্টম হব আমি মহান্ত।

মহান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। তারপর উপভোগের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দিল—

জাতি কুল মান সব ঘুচাইয়া চরণে হইনু দাসী।

রঞ্জন লজ্জায় রাঙা হইয়া ঈষৎ বিরক্তিভরে কহিল, ধেৎ ! ধান ভানতে শীবের গীত। তোমার হ'ল কি মহান্ত ?

মৃদু হাসিতে হাসিতে মহান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, রসিকের রস এসেছে।

আরও বিরক্ত হইয়া রঞ্জন বলিল, তা তুমি কি বলছ বল ? আমাকে ভেক দেবে তুমি ?

নির্ব্বিকারভাবে রসিকদাস বলিল, রাই-কমল বলে তো দোব।

রুষ্ট হইয়া রঞ্জন বলিল, কেন ? কমলি কি তোমার হাকিম নাকি ?

হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া রসিক বলিল, হুঁ।

তবু যদি বগ-বাবাজী না বলত সে !—রঞ্জন ক্রোধভরে উঠিয়া পড়িল।

রসিকদাস তখনও তেমনই হাসিতেছিল, সে কথা কহিল না। রঞ্জন বলিল, বেশ, চললাম আমি তারই কাছে।

রসিকদাস গুনগুন করিতে করিতে দাড়িতে বিনুনি পাকাইতে আরম্ভ করিল।

কমলি তখন আখড়ায় জোড়া-লতার ছায়াতলে বসিয়া সেই কুলগুলি বাছিতেছিল, মাঝে মাঝে রঞ্জনকে প্রতারণা করার কৌতুক স্মরণ করিয়া আপনার মনেই সে হাসিয়া উঠিতেছিল। ও-পাড়ার ভোলা আসিয়া কমলির নিকটে বসিয়া বলিল, কমলি!

স্বরখানি তরঙ্গায়িত করিয়া অনাবশ্যক দীর্ঘ উচ্চারণে কমলি উত্তর দিল, কি—!

ভোলা বলিল, এই এলাম একবার।

নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে ভোলার স্বরভঙ্গী অনুকরণ করিয়া কমলি বলিল, বেশ, যাও এইবার। সে ব্যঙ্গে ভোলা এতটুকু হইয়া গেল। হাঁটু দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল। কমলিও কুল-বাছা রাখিয়া ভোলার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া বসিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, বাঁদরের মত বসলি যে উপু হয়ে? ভোলার লজ্জার আর পরিসীমা ছিল না। সে পলায়নের অজুহাত খুঁজিতেছিল। কমলি বলিল, আমার কুলগুলো বেছে দে না ভাই। আমি একটু বসি।

ভোলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে তাড়াতাড়ি কুল বাছিতে বসিল।

বিচিত্র খেয়ালী চপলা মেয়েটি অকস্মাৎ দুলিয়া দুলিয়া আরম্ভ করিল—

এক যে রাজা তিনি খান খাজা
তাঁর যে রাণী তিনি খান ফেণী
তাঁর যে পুত হাবা গোবা ভূত
মুখে খায় সর গালে খায়—

সঙ্গে সঙ্গে সে বাঁ হাতে চড় উঠাইয়াছিল। কিন্তু ভোলা চট করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। কমলির কলকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল জলতরঙ্গের মত হাসি।

ভোলা বলিল, কমলি! স্বর তাহার কাঁপিতেছিল।

হাতখানি আকর্ষণ করিয়া কমলি বলিল, ছাড়্ ভোলা, ছাড়্ বলছি।

ভোলা বলিল, না।

কমলি মুক্ত ডান হাতে একমুঠা কুল লইয়া ভোলার মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া বসিল। পাকা কুলগুলি ছিতরাইয়া চটচটে শাঁসে ভোলার মুখখানা ভরিয়া গেল। কমলির হাত ছাড়িয়া ভোলা মুখ মুছিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কমলি সেই হাসি হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

ঠিক এই সময়টিতেই বাহির হইতে ডাক আসিল, চিনি!

ভোলা দুর্ব্বল মানুষ, সে রঞ্জনকে বড় ভয় করিত। ডাক শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে বাহিরের দিকে ছুটিল। প্রবল কৌতুকে উচ্ছলা কমলি তাহাকে ডাকিল, যাস না ভোলা, যাস না। ভয় কিসের রে? বলিতে বলিতে

সে বাহিরের দরজায় আসিয়া দেখিল, এ মুখে পলাইতেছে ভোলা, বিপরীত মুখে দ্রুতগমনে চলিয়াছে রঞ্জন।

কমলি ডাকিল, লঙ্কা, লঙ্কা হে!

রঞ্জন উত্তর দিল না, একবার ফিরিয়া চাহিল না পর্য্যন্ত।

কমলি বুঝিল, রঞ্জন রাগ করিয়াছে, ভোলার সঙ্গে কথা বলিলেই রঞ্জনের মুখ ভার হয়, আজ তো ভোলার সঙ্গে বসিয়া সে হাসিতেছিল। কিন্তু এতটাও তাহার সহ্য হইল না। ভোলাকে ধরিয়া দু ঘা দিলেই তো হইত! তা না, উল্টা রাগ করিয়া যাওয়া হইতেছে! সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা—আচ্ছা, এই হ'ল। মনে থাকে যেন।

বলিয়াই সে ফিরিল। দুই পা ফিরিয়াই আবার সে দরজার মুখে আগাইয়া আসিয়া বলিল, আমি কারও কেনা বাঁদী নই।

বলিয়াই সে এদিকে মুখ ফিরাইয়া ভোলাকে ডাকিল, ভোলা, ভোলা! কিন্তু পথের বাঁকের অন্তরালে ভোলা তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আখড়ার মধ্যে ফিরিয়া কমলি আবার ফুল বাছা শুরু করিল। একটা ফুল হাতে লইয়া সে আপন মনেই বলিয়া গেল, ও-রে! চ'লে গেলি—গেলিই। আমার তাতে ব'য়েই গেল। একেই বলে, আলুনো রাগ। তা রাগ করলি করলি, নিজের ঘরে ভাত বেশি ক'রে খাবি।

সে হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসির বদলে চোখে আসিল জল। অভিমানভরে সে পটপট করিয়া ফুলের বোঁটা ছাড়াইয়া চলিল।

কতক্ষণ পর কে জানে, কমলির হুঁশ ছিল না।

কামিনী ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া তিক্তস্বরে ভৎর্সনা করিয়া কমলিকে বলিল, ও—মাগো! এখনও উনোনের মুখে কাঠ পড়ে নাই, জলের কলসী ঢনঢন করছে! এ কি? বলি, হ্যাঁ লো কমলি, তোর রীতকরণের রকম কি বল্ দেখি?

কমলি অকারণে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, ঝঙ্কার দিয়া সে বলিল, পারব না, আমি পারব না। খেতে না হয় নাই দেবে।—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, শুধুই বকুনি, শুধুই বকুনি! যার তার রাগ সব আমার ওপর। কেন, আমি কার কি করেছি?

কামিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে তো এমন কিছু বলে নাই! তবু আদরিণী মেয়েটির কান্না তাহার সহ্য হইল না। মেয়ের পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া সে বলিল, কিছু তো বলি নাই আমি তোকে মা। বলেছি, বুড়ো মানুষ তেতে পুড়ে এলাম। এখন জল আনা, কাঠ যোগাড় করা—

চোখের জল চোখে তখনও ছলছল করিতেছিল, কমলির মুখে অমনই হাসি দেখা দিল। বোধ হয় খানিকটা লজ্জাও পাইল। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া শূন্য কলসীটা কাঁখে তুলিয়া বলিল, জল নিয়ে আসি আমি—এলাম ব'লে।

মা হাসিল। ফুলের ঘা সয় না তাহার কমলের।

কমলি চলিয়া যাইতেই আসিয়া প্রবেশ করিল মহেশ্বর

মোড়ল—রঞ্জনের বাপ, সে যেন এই অবসরটুকুর প্রতীক্ষাতেই কোথাও দাঁড়াইয়া ছিল। একেবারেই সে কামিনীর হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া একান্ত কাকুতিভরে বলিল, কামিনী, তোরও সন্তান আছে। আমার ওই একমাত্র সন্তান। আমার সন্তান আমাকে ফিরে দে কামিনী। তোর ভাল হবে।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া সবিস্ময়ে কামিনী প্রশ্ন করিল, কি, হ'ল কি মোড়ল ?

সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া সজল চক্ষে মহেশ্বর বলিল, বাড়ি থেকে সে পালিয়ে এসেছে। তার মাকে ব'লে এসেছে, বোষ্টম হবে।

কামিনী সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, এতদূর তো ভাবি নাই আমি মোড়ল। কিন্তু এখন ছাড়াছাড়ি করলে কি মেয়েরই আমার সুখ হবে ? আমাকে কি মা হয়ে সন্তানের বুকে শেল হানতে বল তুমি ?

মহেশ্বর বলিল, টাকা দোব আমি, তোমার মেয়েকে কিছু জমি লিখে দোব আমি কামিনী।

বাধা দিয়া কামিনী বলিল, ছি, আমার মেয়ের কি ইজ্জৎ নাই মোড়ল ?

মোড়ল বলিয়া উঠিল, রাম রাম রাম ! সে বললে জিভ খ'সে পড়বে আমার। কিন্তু ভেবে দেখ কামিনী, সন্তান তো আমারও। ওই একটি সন্তান।

একটু চিন্তা করিয়া কামিনী বলিল, যাও মোড়ল, আমি

কমলিকে নিয়ে গাঁ থেকে চ'লে যাব। তুমি তোমার ছেলেকে বাগিয়ে নিও।

বিষণ্নভাবে মহেশ্বর বলিল, গাঁ থেকে চ'লে যেতে তো বলি নাই আমি কামিনী।

কামিনী বলিল, না। মেয়ের চোখের উপর রঞ্জনকে আমি রাখব না মোড়ল। আমি ভিখিরী, কিন্তু মেয়ে তো আমার কম আদরের নয়। আর বোষ্টম জাত, পথই তো আমাদের ঘর গো।

সহসা বাহিরে বেড়ার ধারে কি একটা শব্দ হইল। কি যেন সশব্দে পড়িয়া গেল। কামিনী ছুটিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে বলিতেছিল, কে? কমলি?

সত্যই কমলি বেড়ার পাশে সিক্ত বস্ত্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। তাহার কাঁখের জলভরা মাটির কলসীটা পড়িয়া ভাঙিয়া গিয়াছে।

মহেশ্বর ত্রস্তপদে অপরাধীর মতই যেন পলাইয়া গেল। স্নেহকোমল স্বরে কামিনী বলিল, কলসীটা ভেঙে গেল! যাক। আয়, ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল্।

কমলি হাসিয়া বলিল, না, জল আনি।

মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মেয়েটি তাহার সেই মেয়ে কমলিই বটে, কিন্তু হাসিটি তো তাহার নয়! কমলির মুখে এ হাসি তো সাজে না। কামিনীর বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল।

কমলি ঘাটের দিকে ফিরিয়াছিল, কামিনী বলিল, না।

এলাম ব'লে।

দাঁড়া। আমিও যাব। একটা ঘড়া লইয়া কামিনী বাহির হইয়া আসিল। পুকুরে অগাধ জল। কমলির অভিমান তাহার চেয়েও বেশি।

পথে যাইতে যাইতে কমলি বলিল, মা!

কি রে?

সেই ভাল মা—চল, আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

কামিনী চমকিয়া উঠিল। কমলি কথাটা শুনিয়াছে। কিন্তু কথার উত্তর দিতে পারিল না। তখন তাহার চোখের কোণে রুদ্ধ অশ্রুর বান ডাকিয়াছে।

কমলি বলিল, রাসে নবদ্বীপে মেলা হয়। চল মা, তার আগেই আমরা চ'লে যাই। সন্তান হারানোর অনেক দুঃখ মা। নন্দরাণীর দুঃখের কথা ভেবে দেখ।

কামিনী অবাক হইয়া গেল। কমলির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, কমলি যেন অকস্মাৎ কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! মনে হইল, সে যেন তাহার সখীর সঙ্গে কথা বলিতেছে। সেও সব ভুলিয়া এই মুহূর্ত্তটিতে অন্তরঙ্গ সখীর মতই প্রশ্ন করিয়া বলিল, তোর কি খুব কষ্ট হবে কমলি?

হাসিয়া কমলি বলিল, দূর।

মা বলিল, লজ্জা করিস না মা।

ধীরভাবে কমলি বলিল, না।

জল লইয়া ফিরিবার পথে কামিনী বলিল, নবদ্বীপে চাঁদের

মত চাঁদ খুঁজে তোর বিয়ে দোব আমি। সে যেন এতক্ষণে মনের মত শোধ তুলিবার উপায় পাইয়াছে।

ঘরে কলসী নামাইয়াই চটুল চঞ্চল গতিতে কমলি বাহিরের পথ ধরিল। মা বলিল, কোথায় যাবি আবার ?

নবদ্বীপ যেতে হবে, ব'লে আসি বগ-বাবাজীকে।—বলিয়া সহজভাবেই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কামিনী কিন্তু ওই হাসিতে সান্ত্বনা পাইল না। মেয়ে চলিয়া যাইতেই সে কাঁদিল। বার বার চোখের জল মুছিল।

অন্যায় তাহারই। তাহারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মেয়েকে এমন ভাবে রঞ্জনের সঙ্গে মাখামাখি করিতে দেওয়া উচিত হয় নাই। এতটা সে ভাবে নাই ; কিন্তু ভাবা উচিত ছিল। দুইটি কিশোর আর কিশোরী! বিচিত্র এর রীতি! কেমন করিয়া যে কোথায় বাঁধন পড়ে! পরাণ-ছাড়িলেও এ বাঁধন ছেঁড়ে না।

কমলি বাহির হইতে ডাকিল, মা, এই নাও, বললে বিশ্বাস করে না। তুমি বল, তবে হবে। কমলি বগ-বাবাজীকে লইয়া হাজির করিয়াছে।

কামিনী বলিল, ব'স মহান্ত, ব'স। কথা আছে, শোন। কমলি, যা তো মা, তোর ননদিনীর বাড়ি থেকে খানিকটা নুন নিয়ে আয় তো।

কমলিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, ওই তো ঘরে সের দরুনে নুন রয়েছে।

তুই যা না, ওতে হবে না।

ওতে না হ'লে মণ দরুনে মুনেও তোমার মরণ হবে না। আমি পারব না।

যাও না মা, একটুখানি বেড়িয়েই এস না হয়। মায়ের কথা শুনলে বুঝি পাপ হয়?

এবার কমল হাসিয়া বলিল, আমার সামনেই বলতে পারতে মা। কমল তোমার শুকোত না। বেশ, আমি যাচ্ছি।

সে চলিল ননদিনীর বাড়ি। ননদিনী কাছ্ পাড়ার মোড়লদের মেয়ে, কমলির খেলাঘরের পাতানো সেই ননদিনী। কাছ্ বাপমায়ের একমাত্র সন্তান, আদরে বর্ষার দাছরীর মত সে মুখরা। হয়তো ভুল হইল, শুধু মুখরা বলিলে কাছর প্রশংসা করা হয়। মেয়েটি মুখরার উপরে অপ্রিয়-সত্য-ভাষিণী। লোকে বলে, নবজাতা কাছর মুখে তাহার মা নাকি মধুর প্রলেপ দিতে ভুলিয়াছিল। পাড়ার লোকে কাছকে 'সাত কুঁছলী'র মধ্যে আসন দিয়াছে। ঘরে বসিয়া অনেকে তাহার মাথা খায়। ননদিনী-পাতানো কমলিনীর সার্থক হইয়াছে। কাছর ইহারই মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গরিবের ছেলে দেখিয়া বিবাহ দিয়া তাহার বাপ জামাইকে ঘরেই রাখিয়াছে।

পথ হইতেই কাছর গলা শোনা যাইতেছিল, ও মাগো! একেই বলে—যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। আমি পান খাই, আমার বাপের পয়সায় খাই। তাতে তোমার চোখ টাটায় কেন বল তো?

কমলিনী বুঝিল, এ কোন্দল হইতেছে কাছুর স্বামীর সঙ্গে। মা-বাপের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইলেই পনরো বছরের কাছু প্রবীণা গিন্নীর মত কোমর বাঁধিয়া স্বামীর সঙ্গে কোন্দল জুড়িয়া দেয়। সে দুয়ারে ঢুকিয়াই গান ধরিয়া সাড়া দিল—

ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাখা
কালসাপিনীর জিহ্বা যেন বিষে আঁকা বাঁকা
ও আমার দারুণ ননদিনী।

কাছু কোন্দল ছাড়িয়া খিলখিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। কমল বলিল, কুঞ্জে প্রবেশ করতে পারি কুঞ্জেশ্বরী?

কাছু বলিল, মর্ মর্ মর্, ঢং দেখে আর বাঁচি না। আয় আয়।

তারপর তীব্রস্বরে কাহাকে বলিল, ভারি বেহায়া তুমি। যাও না বাইরে। বউ এসেছে।

কমল প্রবেশ করিয়া বলিল, আহা, থাকুকই না বেচারী, যুগল দেখে চোখ সার্থক করি।

কাছু হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, এক হাতে কোদাল আর হাতে কাস্তে নিয়ে শ্যামকে মানাবে ভাল। ব'স্, ব'স্ ভাই। দিন রাত ব্যাজব্যাজ করছে, মলাম আমি। দাঁড়া, আমি পান নিয়ে আসি। দোক্তা নিবি, দোক্তা?

পান-দোক্তা মুখে পুরিয়া কমল বলিল, বিদায় নিতে এলাম ননদিনী।

সে কি? রাসে কোথাও যাবি বুঝি?

নবদ্বীপ।

কবে ফিরবি?

কমলিনীর চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে ম্লান কণ্ঠে বলিল, আর ফিরব না ভাই কাহু।

কাহু বলিয়া উঠিল, সে কি? কি বলছিস তুই বউ, আমি যে বুঝতে পারছি না।

অবরুদ্ধ ক্রন্দনে কমলিনীর ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া শুধু কাঁপিয়া উঠিল। কোন কথা তাহার ফুটিল না।

তাহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া কাহু বলিল, কি হয়েছে ভাই বউ? আমাকে বলবি না?

ধীরে ধীরে সমস্ত কথাগুলি বলিয়া কমলিনী বলিল, এত সব কথা তো কোনদিন ভাবি নাই ভাই কাহু। কিন্তু আজ—

কথা সে শেষ করিতে পারিল না। আবার তাহার ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কাহু যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে কমলিনী মৃদু হাসিয়া বলিল, সে বলেছে, সে বিয়ে করবে না, জাত দেবে। তা ভাই, মা-বাপের ছেলে মা-বাপের থাক্। আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

কাহু বলিয়া উঠিল, তা মোড়লও কেন বোষ্টম হোক না? বোষ্টম কি ছোট জাত নাকি? না, তারা মানুষ নয়? আমি বলব রঞ্জনদাদার বাবাকে, আমি ছাড়ব না। ভারি তো, ওঃ!

কমলিনী বলিল, না। বার বার সে ঘাড় নাড়িল—না।

কানু একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এক কাজ কর্ বউ। হোক না রঞ্জনদাদা বোষ্টম। তখন ছেলের টানে—

বাধা দিয়া কমলিনী বলিল, ছি!

কানু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। চোখ তাহার ছলছল করিতেছিল। কমল অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল, কানুকে ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল, ও মা, এ যে নতুন কাণ্ড! বউয়ের শোকে ননদ কাঁদে, মাছের মায়ের কান্না! শোন্ শোন্ ভাই, একখানা গান শোন্।

মৃদুস্বরে সে গান ধরিল—

> ও আমার দারুণ ননদিনী ও তুই পরম সন্ধানী
> যেথায় যাব সেথায় যাবি লাগাইবি লেঠা
> ছাড়ালে না ছাড়ে যেন শেয়াকুলের কাঁটা।

গানের অর্দ্ধপথে কানু তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আর দেখা হবে না ভাই বউ?

হাসিয়া কমল বলিল, কেন হবে না? এই তো নবদ্বীপ। নন্দাইকে নিয়ে চ'লে যাবি—কেমন?

কানু বলিল, তিন বার ক'রে যাব আমি বছরে—রাসে, দোলে, ঝুলনে। আজ কিন্তু তোর কাছে শোব ভাই রাত্রে।

কমলিনী হাসিয়া বলিল, নন্দাই?

কানু বলিল, মর্।

কমল তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিল, মরব। কিন্তু সখি, না পুড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে—

কাহু তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, হাত দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিল, না না। ও গান তুই গাস না। না।

আখড়াতে যখন সে ফিরিল, রসিকদাস তখনও বসিয়া ছিল। কমলকে দেখিয়া সে গান ধরিয়াছিল—

গোরার সেরা গোরাচান্দ চল দেখে আসি সখি!

কমল মৃদু হাসিয়া বলিল, গান ভাল লাগছে না বগ-বাবাজী।

রসিকও মৃদু হাসিল। বলিল, তাই তা হ'লে হবে রাইয়ের মা। চ'লে চল যত শিগগির হয়। আমরা বোষ্টম, আমাদের প্রভুর চরণতলই ভাল।

রাস্তায় বাহির হইয়া সে চলিতে চলিতে আবার গান ধরিল—

মথুরাতে থাকলে সুখে আসতে তারে বলিস নে গো।
তাতে মরণ হয় যদি মোর সুখের মরণ জানিস সে গো॥

তিন

নবদ্বীপে কামিনী বেশ জাঁকিয়া বসিল। স্বামীর আমল হইতে গোপন সঞ্চয় ছিল, তাহা হইতেই সে বাড়িঘর কিনিয়া আখড়া বাঁধিয়া বসিল। আখড়ার জাঁকজমকেরও অভাব ছিল না। বৈষ্ণব মহান্তদের নিমন্ত্রণ হয়, পরম যত্নে সাধু-সেবা হয়; সকাল-সন্ধ্যায় আখড়ায় নামগানের আসর জমিয়া উঠে।

বলাইদাস, সুবলচাঁদ ইহারা বয়সে তরুণ। সুবল তাহার

উপর সুপুরুষ। সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটি পরম কমনীয় শ্রীতে শান্ত কোমল, মানায় বড় চমৎকার। কথাগুলিও স্নেহশান্ত, নম্র। রসিকদাসের তাহাকে দেখিয়া আশ মেটে না। বাউল বৈরাগী তাহার সহিত সম্পর্কও পাতাইয়া বসিয়াছে। সুবল তাহার সখা—সুবল-সখা বলিয়া ডাকে।

কমলি সেই তেমনই আছে। সেই যেদিন তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া নবদ্বীপে আসে, সেদিন হঠাৎ সে যতটুকু বড় হইয়া গিয়াছিল, ততটুকু বাড়িয়াই সে আর বাড়ে নাই।

অবসর-সময়ে রসিকদাস কমলকে বলে, এ যে চাঁদের হাট বসিয়ে দিলে গো রাই-কমল! আহা-হা—কি সুন্দর রূপ গো! গোরাচান্দের দেশের রূপই আলাদা।

কমলিনী বলিল, তা হ'লে গঙ্গাতীরের রূপে তুমি মজেছ বল। এইবার ভাল দেখে একটি বোষ্টুমী ক'রে ফেলগে বাবাজী।

বলিয়াই সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। কমলের পরিহাসে রস-পাগল রসিকের একটু লজ্জা হইল। সে সলজ্জ-ভাবে হাসিয়া বলিল, রাধে রাধে! রাধারাণীর জাত কৃষ্ণপূজার ফুল—কি যে বল তুমি রাই-কমল!

হাসিতে হাসিতেই উজ্জ্বলভাবে কমলিনী বলিল, প্রসাদী মালা গলায় পরাও চলে গো। পায়ে না মাড়ালেই হ'ল।

রসিক বলিল, আমি বাউল দরবেশ রাই-কমল। বৃন্দে হ'ল আমাদের গুরু। মালা আমাদের মাথায় থাকে গো। এখন তোমার কথা বল।

কি জিজ্ঞাসা করছ, বল ?

নবদ্বীপ কেমন ? রসিক একটু হাসিল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল, কমলের মুখে রক্তাভা দেখিবে।

কিন্তু কমলিনী মাথা নাড়িয়া সর্ব্বদেহে অস্বীকারের ভঙ্গী ফুটাইয়া বলিল, এমন ভাল আর কি মহান্ত ? মহান্ত সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমলিনী আবার বলিল, তবে মা-গঙ্গা ভাল।

প্রবল বিস্ময়ে রসিকদাস বলিল, এমন সোনার গোরায় তোমার মন উঠল না রাই-কমল ? হাসিয়া কমলিনী বলিল, না, বগ-বাবাজী। তবে হ্যাঁ, ওই রূপের মানুষটি যদি পেতাম, তা হ'লে পায়ে বিকতাম, তবে মন উঠত।

রসিক এবার ছাড়িল না, রহস্য করিয়া সে বলিল, বল কি ? রাই-কমল-রঞ্জনকে ভুলে, অ্যাঁ ?

হাসিয়াই কমল উত্তর দিল, তা সোনার মোহর পেলে রূপোর আধুলি ভোলে না কে, বল ?

তবে রাই-কমল, আধুলি-টাকার তফাতের লোকও তো রয়েছে। টাকাটা নিয়ে আধুলিটা ভোল না কেন ?

সাধে কি তোমাকে বগ-বাবাজী বলি ! চুনোপুঁটির ওপরেও তোমার লোভ। দুটো আধুলিতে একটা টাকা। বত্রিশটা আধুলিতে একটা মোহরের দাম হয়, কিন্তু বত্রিশটা গালালেও রূপোতে সোনার রঙ ধরে না। ওটুকু তফাতে আমার মন ওঠে না। এত লোভ আমার নাই।

কামিনী বোধ হয় নিকটেই কোথাও গোপনে বসিয়া কন্যার মনের কথা শুনিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিল না, সম্মুখে আসিয়া বলিয়া উঠিল, তা ব'লে টাকা-আধুলির উল্টো কদরও কেউ করে না মা। তোমার সবই আদিখ্যেতা, হ্যাঁ।

কমলিনী বাসর-ঘরের কনের মত ধরা পড়িয়া হাসিয়া সারা হইল। সে হাসিতে মায়ের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। কামিনী রাগ করিয়াই বলিয়া উঠিল, মরণ! এতে হাসির কি পেলি শুনি? হাসছিস যে শুধু?

কমলিনীর হাসি বাড়িয়াই চলিল। মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলিল, মরণ তোমার। আড়ি পেতে আবার মেয়ের মনের কথা শোনা হচ্ছিল! তারপর উজ্জ্বল হাস্যধারা সম্বরণ করিয়া মৃদু শান্ত হাসি হাসিয়া সে বলিল, তা শুনেছিস যখন, তখন শোন্। টেঁপো-ছাঁদা টাকার মালা গলায় না প'রে যদি কেউ প্রমাণী আধুলির মালাই গলায় দেয়, তাতে নিন্দের কি আছে? ওখানে দরের কথা চলে না বাহাত্তুরে বুড়ী। ও হ'ল রুচির কথা।

অবাক হইয়া কামিনী মুখরা মেয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর তাহার যেন চমক ভাঙিল, বলিল, তবে তোর মনের কথাটাই কি শুনি?

কমলিনী বলিল, বললাম তো, আবার কি বলব?

মা বলিল, কতকাল আর আমার গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবি তুই? বিয়ে তুই কেন করবি না?

তা আবার কখন বললাম আমি ?

কেন তবে সুবলকে মালাচন্দন করবি না ?

দূর !—কেমনধারা মেয়ের মত কথা, মেয়েলী ঢঙ। দূর দূর ! মুখে কাপড় দিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মা বলিল, বেশ, তবে বলাইদাস—

ঠোঁট উল্টাইয়া কমল বলিয়া উঠিল, মর্—মর্—মর্ ! রুচিকে তোর ধন্যি যাই। ওই আমড়ার আঁটির মত রাঙা রাঙা চোখ ! ওকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

রাগ করিয়া কামিনী উঠিয়া গেল। সমস্ত দিন সে আর মেয়ের সঙ্গে কথা কহিল না। কমলিনী সেটুকু বুঝিল। সন্ধ্যার সময় সে আসিয়া মায়ের গা ঘেঁষিয়া বসিতেই মা হাত দুই ছিটকাইয়া সরিয়া গেল। বলিল, কচি খুকীর মত গা ঘেঁষে বসা কেন আবার ?

কমল কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিল। তারপর অনুপেক্ষণীয় গম্ভীর স্বরে মাকে বলিল, দেহ দিয়ে কি গোবিন্দের পূজো করা হয় না মা ?

মা চকিতভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিল। কমল অসঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, মালা কি মানুষের গলাতেই দিতে হবে ?

ওদিকের দাওয়ার উপর ছিল রসিকদাস বসিয়া, সে বলিয়া উঠিল, তাই হয় গো রাই-কমল, তাই হয়। মানুষের মধ্যে দিয়েই

তাঁর পূজো করতে হয়। জান, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' ?

কমল কঠিন স্বরে বলিল, মিছে কথা। ও হচ্ছে মানুষের নিজের ফন্দির কথা। ভগবানের পূজো সে চায় নিজে।

কামিনী বলিল, ও কথা থাক্ না কমল। কিন্তু মা, মা তো তোর অমর নয়—আর ভিখিরীর সম্বলও কিছু নাই যে, তোকে দিয়ে যাব। যা ছিল, তাও ফুরল। কি ক'রে তোর দিন চলবে ?

হাসিয়া কমল বলিয়া উঠিল, হরি ব'লে। নেহাত বোকার মত কথাটা বললি মা। তোর যেমন ক'রে দিন চলছে, তেমনই ক'রে আমারও চলবে। হরি ব'লে পাঁচটা দোর ঘুরলেই একটা পেট চ'লে যাবে আমার।

মা বলিল, তুই তো জানিস না কমল পথের কথা। সাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় মা, কিন্তু পাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় না।

কমল উত্তর দিল, লখিন্দরকে বাসর-ঘরে—লোহার বাসর-ঘরে সাপে খেয়েছিল মা। পথে নয়। ও পথই বল্ আর ঘরই বল্, পাপ এড়িয়ে কোথাও চলা যায় না। আমায় আর ওসব কথা বলিস না মা। সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

কামিনী রসিকদাসকে বলিল, কি করি আমি মহান্ত ?

রসিক আপন মনে গান ভাঁজিতেছিল, সে কোনও উত্তর দিল না।

মানুষের নাকি আশার শেষ নাই। সংসারে চুনিয়া চুনিয়া সে শুধু সংগ্রহ করে আশাপ্রদ ঘটনাগুলি। বাকিগুলি ইচ্ছা করিয়া সে ভুলিতে চায়, ভুলিয়াও যায়। এমনই ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া সে গড়িয়া তোলে কল্পনার আশা-দেউল। কামিনীরও আশা নিঃশেষে শেষ হয় নাই।

সুবলকে লইয়া খানিকটা জটিলতা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তাহা দেখিয়াই কমলের মায়ের একটা আশ্বাসপূর্ণ প্রত্যাশা জাগিয়াছিল। যতই নিন্দা সুবলের সে করুক, তাহাকে দেখিলে কমল প্রফুল্ল হইয়া উঠে। আগ বাড়াইয়া হাসিমুখে তাহাকে সম্ভাষণ করে, সুবল-সাঞাতী, শোন।

রসিক মুগ্ধভাবে বলিয়া উঠে, সুবল-সখা, গোরারূপে তোমায় মানায় না ভাই। রঙটি তোমার কালো হ'লেই যেন ভাল হ'ত।

সুবল লজ্জা পায়। সে মাথাটা নত করিয়া রাঙা হইয়া উঠে। উত্তর দেয় কমল, সপ্রতিভ মেয়েটির মুখে কিছুই বাধে না। অবলীলাক্রমে ধারালো বাঁকা ছুরির মত উত্তর দেয়, সমাজে খেতে ব'সে নিজের যে জিনিসটার ওপর লোভ হয়, লোকে সেই জিনিসটা পাশের পাতে দিতে সুপারিশ করে। কালো রূপটা তোমার হ'লেই ভাল হ'ত বগ-বাবাজী। রাই-কমলকে পাশে মানাত ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই উদ্দাম হাসির তরঙ্গে সে নিজেই যেন মুখরিত হইয়া উঠে। তরুণ অবয়বের প্রতি অঙ্গটি তাহার সুপ্রত্যক্ষ কম্পনে কাঁপে, মনে হয়, প্রতিটি অঙ্গ যেন নাচিতেছে।

রসিকদাস লজ্জিত হইয়া বলে, রাধে রাধে! আমরা হলাম বাউল রাই-কমল। ব্রজের শুক আমরা। লীলার গান গাওয়াই আমাদের কাজ গো।

কমল হাসিতে হাসিতে বলে, আমি না হয় সারীই হতাম শুকের।

রসিকদাস পলাইয়া যায়। বলে, রণে ভঙ্গ দিলাম আমি। পিঠে বাণ মারা ধর্ম্মকাজ হবে না রাই-কমল।

মাও কাজের অজুহাতে সরিয়া যায়। হাসি গল্প গান করিয়া সুবল চলিয়া যায়। পথে পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকে, শোন শোন, ওহে সুবল-সখা!

সুবল পিছন ফিরিয়া দেখে, রসিকদাস। রসিক নিকটে আসিয়া বলে, কি বললে রাই-কমল?

সুবল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কি আবার বলবে? কিসের কি?

রসিক বলিয়া উঠে, কমল ঠিক বলে, মেয়ে গড়তে গড়তে বিধাতা তোমাকে ভুলে পুরুষ গ'ড়ে ফেলেছে। মালা—মালা—বলি, কমল-মালা গলায় উঠবে তোমার? কিছু বুঝতে পারছ?

সুবল লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে, মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

রসিক যেন রুষ্ট হয়। বলে, কি তুমি হে?

লজ্জিত সুবলকে দেখিয়া আবার মায়াও হয়। কিছুক্ষণ পর সান্ত্বনা দিয়া বলে, খেয়ে তো ফেলবে না রাই-কমল তোমাকে।

সে তো আর বাঘ ভালুক নয়। তার মতটা জান না একদিন।

মৃদুস্বরে সুবল বলে, কাল জানব।

রসিক খুশি হইয়া বলে, মালা-চন্দনের দিন তোমার মালা আমি গাঁথব কিন্তু।

হাসিয়া সুবল বলে, বেশ।

পরদিন ঠিক সেই স্থানটিতে রসিক অপেক্ষা করিয়া থাকে। সুবল আসিতেই হাসিতে হাসিতে বলে, মালা গাঁথি সুবল-সখা?

সুবল নীরব। রসিকদাস বলে, কথা কও না যে হে? কি হ'ল?

সুবল বলে, কমলের মা ছিল ওদিকের ঘরে—

রসিক বলে, কি বিপদ! তোমার জন্যে সে কি বনে যাবে? তোমার কোনও ভয় নাই, কামিনী নিজে আমায় তোমাকে বলতে ব'লে দিয়েছে। সে নিজে দিনে দশ বার ক'রে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছে যে, কেন তুই সুবলকে বিয়ে করবি না? কাল কিন্তু এর শেষ করতে হবে। বুঝলে?

ঘাড় নাড়িয়া সুবল জানায়, সে বুঝিয়াছে।

পরদিন কামিনীও কোথায় গিয়াছিল। কমলিনী একা বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। সুবল আসিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া রসিকতা করিয়া বলিয়া ফেলিল, রাই-কমলিনী বিমলিনী কেন গো?

কমল ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু হাসির সহিত বলিল,

গোষ্ঠের বেলা যায় যে সখা। তাই ভাবছি, সুন্দর সুবল-সখা আমার বাছনি বুকে এল না কেন? শ্যামের কাছে আমি যাব কেমন ক'রে?

তরুণ সুবলের মনে মোহ ছিল। তাহার উপর রসিকদাসের গত কালের উৎসাহ সে মোহের মূলে ভরসার জলসিঞ্চন করিয়াছে। কমলের কথাগুলির অর্থের মধ্যেও সে তাই অনুকূল ইঙ্গিত অনুভব করিল। যে মোহ এতদিন তাহার মনের কুঁড়ির ভিতরের গন্ধের মত সুপ্ত ছিল, আজ সে মোহ বিকশিত পুষ্পের গন্ধের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া যেন প্রকাশিত হইয়া পড়িল। স্বপ্নভরা চোখে কমলের দিকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে আবিষ্টের মত কমলিনীর হাতখানি ধরিতে হাত বাড়াইল। সে হাত তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

মৃণালের মত লীলায়িত ভঙ্গীতে দেহখানি বাঁকাইয়া সরিয়া আসিয়া কমলিনী বলিল, ছি! এই কি সুবল-সখার কাণ্ড! তোমার মনে পাপ!

অকল্পিত আকস্মিক আঘাত সুবলের কাছে। রসিকদাসের কথা সে ধ্রুব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। মুহূর্ত্তে দারুণ লজ্জায় শান্ত লাজুক বৈষ্ণবটির সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া গেল। মুখ হইয়া গেল বিবর্ণ পাংশু।

বিচিত্র চরিত্র এই চঞ্চলা কিশোরীটির। এইবার সে নিজেই সুবলের হাত ধরিয়া বলিল, এস সখা, ব'স। দাঁড়াও, একটা কিছু নিয়ে আসি পাতবার জন্যে।

কমলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই সুবল পলাইয়া আসিয়া বাঁচিল। লজ্জার ধিক্কারের আর তাহার সীমা ছিল না। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। পিছন হইতে কমলিনী ডাকিল, যে চ'লে যায়, সে আমার মাথা খায়—মাথা খায়।

সুবলকে ফিরিতে হইল। চটুলা চঞ্চলা মেয়েটি তখনই হাসিয়া অনুযোগ করিল, চ'লে যাচ্ছ যে ?

সুবল মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাত দুইটি ধরিয়া কমলিনী বলিল, তুমি আমার সত্যি সুবল-সখা— বেশ।

এবার কণ্ঠস্বরে ছিল সকরুণ একটি আন্তরিকতা, আত্মীয়তা।

সুবল এতক্ষণে মুখ তুলিয়া অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, বেশ। কিন্তু তোমার চোখ ছলছল করছে কেন রাই-কমল ?

সাদা হাসিটি হাসিয়া কমলিনী বলিল, এই হাসছি আমি ভাই।

সেদিন ফিরিবার পথে সুবল রসিকদাসকে বলিল, ও কথা আমাকে বলবেন না।

রসিক বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবল বলিল, মানুষে ওর মন উঠবে না মহান্ত।

কামিনী সমস্ত শুনিয়া আজ আবার বলিয়া বসিল, আমি কি করব মহান্ত ?

রসিক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না বরং মনে তাহার গান গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

কাঞ্চন বরণী, কে বটে সে ধনী, ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে, চপলা চমকে, নীল শাড়ি শোভে গায়॥

... ...

চণ্ডীদাস কহে, ভেব না ভেব না, ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস ধন তোমারি সে আছে ধনী॥

কামিনী কিন্তু অনেক ভাবিয়া সান্ত্বনা আবিষ্কার করে। তাহার কমল এখনও ফোটে নাই।

চার

দিনে দিনে মাস কাটিয়া গেল। মাসে মাসে বৎসর পূর্ণ হইল। কামিনী একাগ্র চোখে মেয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল, এইবার তাহার মনে হইল, কমলকোরক দিনে দিনে ক্রমশ পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা হইয়া উঠিল। কমল আজ পূর্ণ যুবতী। পূর্ণতার গাম্ভীর্য্যে সেই চাপা চাপল্যটুকু যেন ঈষৎ ভারাক্রান্ত। আপনার দিকে চাহিয়া কমলিনী আপনি আপনাকে একটু মন্থর করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বভাবের চটুলতাও ভোলা যায় না। মৃণালের বৃন্তে কমলদলের মত মধ্যে মধ্যে সে হেলিয়া দুলিয়া উঠে। সে চটুল-লজ্জার রূপ অপূর্ব্ব! রসিকদাস সে রূপ দেখিয়া বিভোর হইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে সে গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দেয়—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায় রে—অবনী বহিয়া যায়।

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলে, বলি—বয়স হ'ল কত ?

রসিক একগাল হাসিয়া উত্তর দিল, ভোমরা বয়েস মানে না রাই-কমল। আমরণ ফুলের রূপের বন্দনা গেয়েই বেড়ায়।

কমল ঝঙ্কার দিয়া উঠে, বেশ, তুমি থাম মহান্ত।

আজ পরম কৌতুকে হাসিয়া উঠে রসিকদাস। তাহার সে হাসি আর থামিতে চায় না। রোষভরে কমল আবার বলে, থাম বলছি মহান্ত।

রসিকের হাসি মিলায় না। সে বলে, আমি না হয় থামছি। কিন্তু তুমি 'মহান্ত' নামটি ছাড় দেখি।

কমলিনীর লাজরক্ত রোষদৃপ্ত অধরে হাসির রেখা দেখা দিল। চাপা হাসিতে মুখ ভরিয়া সকৌতুকে সে বলিল, কেন, তুমি মহান্ত নও নাকি ?

খুব জোরে মাথা নাড়িয়া মহান্ত বলিল, না।

তবে তুমি কি ?

রসিক বলিল, আমি রাই-কমলের বগ-বাবাজী।

এবার কমল মুখে কাপড় চাপা দেয়। মুখের চাপা কাপড় ঠেলিয়া তরুণীকণ্ঠের অবাধ্য হাসি জলকলধ্বনির মত বাহির হইয়া আসে।

সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য বাউল গানটির পাদপূরণ করে—

ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মুরছা যায় রে—মদন মুরছা যায়।

কামিনীর দুইটি ইচ্ছা ছিল—কমলের বিবাহ এবং নবদ্বীপের পুণ্যভূমি গৌরচন্দ্রের চরণচ্ছায়ায়, গঙ্গার কোলে চিরদিনের মত চোখ বুজিয়া শেষ শয্যা পাতা।

ইদানীং সে মেয়ের বিবাহের আশা ছাড়িয়া দিয়া কামনা করিত শুধু নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়। তাহার সে ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না, হঠাৎ সে মারা গেল। নবদ্বীপেই দেহ রাখিল। হয় নাই বেশি কিছু। সামান্য জ্বর, তাও বেশি দিন নয়—চার দিন।

কামিনী সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল। শেষের দিন সে বলিল, মরণে আমার দুঃখ নাই মহান্ত। গোরাচাঁদের চরণে মা-গঙ্গার কোলে এ আমার সুখের মরণ। তবে—

রসিক বাধা দিয়া বলিল, মিছে ভাবছ কেন রাইয়ের মা? কি এমন হয়েছে তোমার?

ঈষৎ হাসিয়া কামিনী বলিল, হয়েছে সবই। মহান্ত, তোমরা বুঝতে পারছ না, আমি কিন্তু মরণের সাড়া পাচ্ছি। আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমি যেন তোমাদের হতে দূরে—অনেক দূরে চ'লে যাচ্ছি। কথা বলছ তোমরা, আমি যেন শুনছি অনেক দূর হতে। শোন, মরণে আমার আক্ষেপ নাই, শুধু মেয়ের ভাবনা আমার মহান্ত। কমলির আমার কি হবে মহান্ত?

চোখের জলে রসিকের বুক ভাসিয়া গেল। সে বলিল, ভেবো না তুমি রাইয়ের মা। তাই যদি হয়, তবে তোমার কমলের ভার আমি নিলাম।

কামিনীর মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল, সে আমি জানি মহান্ত। কই, কই, কমলি আমার কই?

পাশেই কমলিনী বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া সে অবরুদ্ধ স্বরে ডাকিল, মা!

অবশ হস্ত মেয়ের মাথায় রাখিয়া কামিনী হাসিতে হাসিতেই বলিল, কাঁদিস কেন রে বুড়ো মেয়ে? মা কি চিরদিন কারও থাকে?

কমলিনী তবুও কাঁদিল। বহুকষ্টে অবশ হস্তখানির একটি স্পর্শ মেয়ের এলানো চুলের উপর টানিয়া দিয়া মা বলিল, শোন্, কাঁদিস না। যাবার সময় নিশ্চিন্ত কর্।

কমলি বলিল, বল?

শোন্, যে লতা গাছে জড়ায় না, সে চিরদিনই ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। জানোয়ারে মুড়ে খায় তার—

কমল বাধা দিয়া বলিল, কষ্ট হচ্ছে মা তোমার—

না। তা ছাড়া, মানুষের মুখে বড় বিষ, ওরে, কলঙ্কের বিষে রাধার সোনার অঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল। না। সে তুই সইতে পারবি না। আমায় কথা দে তুই।

সে হাঁপাইতেছিল।

কমল বলিল, কেন মা? দেবতার হাতে দিয়ে যেতে কি তোর মন সরছে না?

দরদরধারে কামিনীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বার

বার ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, না। কমলি, আমায় নিশ্চিন্ত কর্। বল্, কথা দে।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া এবার কমল বলিল, বিয়ে করব মা।

কামিনী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ!

তারপর সে দুইটি কথা কহিয়াছিল। এক সময় বলিল, বাপ-মায়ের ছেলে কেড়ে নিস না যেন।

হাসিয়া কমল বলিল, না মা।

মহান্ত তখন নাম আরম্ভ করিয়াছে, জয় রাধে রাধে—

কামিনী বলিল, গোবিন্দ গোবিন্দ!

ওই শেষ কথা।

পাঁচ

ফুল ঝরিয়া যায়, আবার ফোটে। কালের তালে তালে ঘুম-পাড়ানিয়া গানের মত বিস্মরণীর গান গাহিয়া মানুষের দুঃখের স্মৃতি ভুলাইয়া দিতেছেন মা-বসুমতী। কমলিনীও দিনে দিনে মায়ের শোক কতকটা ভুলিল। দিনের সঙ্গে সঙ্গে সে চোখের জল মুছিল, তারপর আবার হাসিল, আবার কীর্ত্তন গাহিল। বাউল রসিক যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে হাসিল। ব্যথাতুর শিশু বেদনার উপশমে কান্না ভুলিয়া হাসিলে

মায়ের বুকে যে হাসি দেখা দেয়, রসিকের মুখেও তেমনই হাসি দেখা দিল।

রসিক ভিক্ষা করিয়া আনে, কমল রাঁধে-বাড়ে। দিন এমনই করিয়াই চলিতেছিল, মাস তিনেক পর একদিন রসিক বলিল, রাই-কমল, একটা কথা বলছিলাম।

তাহার কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গীতে যেন একটা কুণ্ঠা ছিল। এটুকু কমলের বড় ভাল লাগিল। চটুল রসিকতায় বাউলকে আরও সে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল।

বলিল, বল ?

রসিক বলিল, বলছিলাম কি—

কমল বলিয়া উঠিল, কি বলছিলে ?

রসিক আরও কুণ্ঠিতভাবে বলিল, তা হ'লে—

কমলিনীর হাসি স্ফুট হইয়া উঠিল, বলিল, তা হ'লে ? কি তা হ'লে বল না গো ? বগ-বাবাজীর গলায় কি কাঁটা আটকাল নাকি ?

বিব্রত রসিক অকারণে গলাটা খাঁকি দিয়া ঝাড়িয়া লইল। বলিল, না—তা—

স্বভাবগত কলহাস্যে সমস্ত মুখরিত করিয়া কমল বলিল, তবে গলা ঝাড়লে যে ?

রসিক এবার বলিয়া ফেলিল, তোমার মালাচন্দনের কথা। আমি—ধর, আমার—

কথাটা শুনিবামাত্র চঞ্চল কমলিনী এক মুহূর্তে স্থির হইয়া

গিয়াছিল। একদৃষ্টে সে রসিকের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। কথাটার শেষের দিকে রসিকদাসের কুণ্ঠা দেখিয়া তবুও তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—ম্লান হাসি, বলিল, তোমার ?

রসিক বলিল, আমি বাউল। তা ছাড়া আমার কাছে থাকলে লোকেও মন্দ—

সে আর বলিতে পারিল না। কমল আবার ঈষৎ ম্লান হাসিয়া বলিল, গলার কাঁটাটা ঝেড়ে ফেলতে পারলে না ? আচ্ছা, এ বেলাটা সবুর কর মহান্ত, ও বেলায়—

কথাটা সে শেষ করিল না, তাহার পূর্ব্বেই ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সারাটা দিন আর সে বাহির হইল না।

রসিকদাসও সারাটা দিন বাহিরে মাথায় হাত দিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার কিছু আগে কমল ঘর হইতে বাহির হইল।

রসিক বসিয়া ছিল পূর্ব্বমুখে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সন্ধ্যার অস্তমান সূর্য্যের স্বর্ণাভা কমলের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আজ তবু পদাবলীর কোন কলি মনে পড়িল না। অপরাধীর মতই রসিক বলিল, রাই-কমল !

বিচিত্র হাসি হাসিয়া কমল বলিল, মালার জন্যে যে ফুল চাই মহান্ত।

সবিস্ময়ে রসিক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমল বলিল, আজই আমার মালাচন্দন হবে মহান্ত। ফুল চাই। আয়োজন চাই।

পরম আনন্দে উঠিয়া রসিক বলিল, সুবল-সখাকে ডেকে আনি আমি।

বাধা দিয়া কমল বলিল, পরে। এখন থাক্। আগে ফুল নিয়ে এস তুমি।

রসিক বালকের মত আনন্দবিহ্বল হইয়া চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে সিক্ত বক্ষে কতকগুলি পদ্মফুল লইয়া সে ফিরিল। বলিল, রাই-কমল, কমলফুলই এনেছি আমি।

আরও বোধ হয় কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু কমলিনীর রূপ দেখিয়া সে কথা আর রসিকদাস উচ্চারণ করিতে পারিল না। কমলের চুলের রাশি ছিল এলানো। পরনে টকটকে রাঙাপাড় তসরের শাড়ি একখানি। নাকে ক্ষীণ রেখায় আঁকা শুক্ল-প্রতিপদের চন্দ্রকলার মত রসকলিটি যেন উঁকি মারিয়া হাসিতে-ছিল। কপালে সন্ধ্যার গোধূলি-তারার মত শুভ্র টিপ একটি। গলায় তুলসীকাঠের মালা, হাতে দুইগাছি রাঙা রুলি। অঙ্গে আর কোন আভরণ নাই; কিন্তু তাই যেন ভাল।

কমলিনী হাসিল।

রসিক বলিল, একটু খুঁত হয়েছে রাই-কমল। নীলাম্বরী পরলেই ভাল হ'ত।

কমল বলিল, সে বাসরে পরব। নীল কালো বিয়ের সময় পরতে নেই যে। এখন তুমি কাপড়টা ছাড় দেখি। ওই দেখ, কাপড় রেখেছি।

রসিক দেখিল, কমলিনীর শখ করিয়া সেদিনের কেনা সেই

নূতন শান্তিপুরে ধুতিখানি রহিয়াছে। পরমানন্দে কাপড়খানা সে পরিধান করিয়া বলিল, শিরোপা যে মজুরির চেয়েও দামী গো! তারপর, এইবার হুকুম কর, সুবল-সখাকে ডাকি।

চন্দন ঘষা শেষ করিয়া কমল বলিল, পরে। আগে মালা দুগাছা গেঁথে ফেলি, এস। তুমি একগাছা গাঁথ, আমি একগাছা গাঁথি।

রসিকের আজ আর আনন্দ যেন ধরিতেছিল না। সে তাড়াতাড়ি মালা গাঁথিতে বসিয়া গেল। বলিল, খুব ভাল হবে রাই-কমল। সুবল-সখা আসবামাত্র মালা পরিয়ে দেবে। সে অবাক হয়ে যাবে।

কমলের হাতের মালা শেষ হইয়া আসিল। সে তাগিদ দিল মহান্তকে, বলি আর দেরি কত? আমার শেষ হ'ল যে।

রসিক রসিকতা করিয়া উত্তর দিল, রাই, ধৈর্য্যং—

তারপর সুতার গিঁঠ বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, আমার মালাও তৈরি গো।

কমলিনী আপন হাতের মালাগাছি রসিকের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, গোবিন্দ সাক্ষী।

রসিকের মুখ হইয়া গিয়াছিল বিবর্ণ পাংশু। কমল তাহাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া বলিল, এইবার তোমার মালা আমায় দাও।

এতক্ষণে রসিকের কথা সরিল। সে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কি করলে রাই-কমল?

কমল সুন্দর হাসি হাসিয়া বলিল, মালার প্রসাদ দেবে না আমায়?

বলিয়া চন্দন লইয়া রসিকের জরাজীর্ণ পাণ্ডুর ললাট চর্চ্চিত করিয়া দিল।

রসিকের চোখের দৃষ্টি ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এক রহস্যময় দৃষ্টিতে কমলের মুখপানে চাহিয়া সে হাসিল। তারপর আপন হাতের খসিয়া-পড়া মালাগাছি তুলিয়া লইয়া কমলের গলায় পরাইয়া দিল। তাহার সুন্দর মসৃণ তরুণ ললাটে সুন্দর ছাঁদে আঁকিয়া দিল সুবঙ্কিম রেখায় চন্দনবিন্দুর অলকাতিলকার সারি। আঁকিতে আঁকিতে সে গাহিতেছিল—

কৃষ্ণপূজার কমল আমি রেখে দিব মাথায় ক'রে।

কমল লীলাকৌতুকে বলিয়া উঠিল, কত দেরি তোমার? বাসর সাজাতে হবে যে।

রসিক বলিল, না গো সখি, না। বাসর সাজাব আমি। আমাদের লীলা হবে উল্টো—এ লীলায় তুমি কাঁদাবে, আমি কাঁদব।

কমল বলিল, চল, এখন গৌরাঙ্গ-মন্দিরে চল। মহান্তের কাছে যাই। যেগুলো করতে হবে, সেগুলো করা চাই তো!

*   *   *   *

রসিকদাসই বাসর সাজাইল। কমল দেখিল, বাসর সাজানো হইয়াছে—এক দিকে টাটকা ফুলে, অন্য দিকে শুকনো ফুলে।

কমল মুখ তুলিয়া মহান্তের দিকে চাহিল। রসিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি আর আমি।

কমল বলিল, তার চেয়ে আঙারে সাজালে না কেন? তাহার কণ্ঠস্বর যেন কাঁপিতেছিল।

রসিক অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া বলিল, না না, শুকনো ফুল ফেলে দিই।

কমল বাধা দিল। সে শুষ্ক ফুলশয্যার উপর বসিয়া বলিল, এ শয্যে আমার। তোমার শুকনো শয্যে হবে না, তোমার হবে টাটকা শয্যে।

কথা শেষ করিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ একটা অননুভূত তীব্রতায় জীর্ণদেহ প্রৌঢ়ের বক্ষপঞ্জরের অভ্যন্তরটা গুরগুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণ কম্পনের রেশে সর্ব্বদেহ কাঁপিতেছিল।

প্রৌঢ় বাউল কয় পা পিছাইয়া গেল, কম্পিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, থাক্ রাই-কমল, থাক্।

কমল সমান হাসি হাসিয়া কহিল, তা কি হয় গো? এ যে নিয়ম। আর আমার বিয়ের সাধ-আহ্লাদ তো একটা আছে।

ধীরে ধীরে আপনাকে দৃঢ় করিয়া লইয়া মহান্ত বিকশিত কোমল কুসুম-শয্যার উপর গিয়া বসিল। তারপর কমলের হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, রাই-কমল, আধুলির বদলে শেষে আধলার মালা গলায় গাঁথলে?

বাউল বিচিত্র হাসি হাসিল।

কমল হাসিল। বলিল, সোনায় তামায় বড় ধাঁধা লাগে গো। সোনা ব'লেই তো গলায় গাঁথলাম। তামা যদি হয়, তবুও জানব, ওই আমার সোনা। সোনা-তামার তফাত তো মনের ভুল। এ তো শুধু আমার রইল। কদর করব আমি। পরের সঙ্গে দর করতে হাটে তো যাচ্ছি না।

ঘরের কোণে কমল আজ ঘৃতদীপ জ্বালিয়াছিল। প্রদীপটা জ্বলিতেছিলও বেশ উজ্জ্বলভাবে। রসিক কমলের মুখখানি পরিপূর্ণ আলোর ধারার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কমল হাসিল।

রসিকের দেখিয়া যেন আর তৃপ্তি হয় না—আশ মেটে না। কমল বলিল, ছাড়।

সে কেমন ভয় পাইয়া গেল। জীর্ণ বাউলের বার্দ্ধক্যমলিন চোখের কি তীব্র জ্বলজ্বলে একাগ্র দৃষ্টি!

সে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রসিক সহসা উন্মত্তের মত প্রবল আকর্ষণে কমলের পুষ্পিত দেহখানিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। কমল ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ওই শীর্ণ বাহুতে যেন মত্তহস্তীর শক্তি! কঙ্কাল যেন ফাঁসির দড়ির মত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে!

কমলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে আর্ত্তস্বরে প্রার্থনা করিল, মহান্ত! মহান্ত!

উন্মত্ত বাউল যেন অন্ধ বধির হইয়া গিয়াছে।

ছয়

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কমল দেখিল, মহান্ত দাওয়ার উপর বসিয়া আছে।

কখন যে সে শয্যাত্যাগ করিয়াছে, কমল তাহা জানিতে পারে নাই। কিন্তু মহান্তের মূর্ত্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। রক্ত-মাংসের মানুষটা যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চল মূক— নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টি তাহার। চোখের কোলে কোলে দুইটি গভীর কালো রেখা দেখা দিয়াছে। শুষ্ক নদীর ভাঙন-ধরা তটরেখার মত বিগত বন্যার বার্ত্তা যেন তাহাতে সুপরিস্ফুট।

সবই কমল বুঝিল। আপনাকেই একান্তভাবে অপরাধী করিয়া কমল লজ্জায় দুঃখে এতটুকু হইয়া গেল। কতবার সান্ত্বনার কথা কহিতে গিয়াও সে পারিল না। সমস্ত প্রভাতটা সে আড়ালে আড়ালে ফিরিল।

রসিকদাসই আগে কথা কহিল। সে ডাকিল, কমল ?

ডাকটা কমলের কানে কেমন যেন ঠেকিল—যেন খাটো-খাটো, কণ্ঠস্বরও যেন হিম-কঠিন। কমল তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল নত মুখে।

রসিক তাহার মুখপানে চাহিয়া কাতরভাবে বলিল, কমল, আমি মানুষ।

কমল উত্তর দিল, কেউই পাথর নয়। তবে তুমি আজ পাথর হয়েছ দেখছি।

মহান্তের কণ্ঠস্বরে বাদল যেন ঝরিয়া পড়িল। সে বলিল, অহল্যার মত পাষাণই বুঝি হলাম কমল।

কতকালের গৃহিণীর মত কমল আপনার আঁচল দিয়া মহান্তের সজল চোখ মুছাইয়া দিল। তারপর বলিল, মালা তো ফুলেরই মালা মহান্ত, তাতেও তোমার যদি গলায় ফাঁসিই লাগে, তবে তুমি ছিঁড়ে ফেল।

মহান্ত ধীর ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। সে পারব না। আবার সে ঘাড় নাড়িল—না।

হাসিয়া কমল বলিল, আমার জন্যে ভাবছ? আমার জন্যে তুমি ভেবো না। গোবিন্দ তোমার একার নয়। তার হাতে ছেড়ে দিতেও কি তুমি পারবে না?

রসিক বলিল, না কমল, সে আর আমি পারব না—দেবতার পায়ে নয়, মানুষের হাতেও নয়। আমার ভিতর বাহির তুমিময় হয়ে গিয়েছে। তুমি ছাড়া আমি বাঁচব না। জান কমল, কাল রাত্রে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম, পারি নাই। পা উঠেছে, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারি নাই।

কমল ম্লান মুখে কহিল, কিন্তু আমি যে দুঃখে লজ্জায় ম'রে যাচ্ছি মহান্ত। তোমার এতদিনের ভজন-পূজন সব আমার জন্যে পণ্ড হ'ল।

উন্মত্তের মত কমলের হাত দুইটি আপনার বুকে চাপিয়া ধরিয়া মহান্ত বলিল, যাক—যাক—যাক। সংসারে আমি কিছু চাই না। শুধু তুমি যেন আমায় ছেড়ো না কমল।

প্রবল আকর্ষণে সে কমলকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

কমল বলিল, ছাড়। ওঠ, উঠে স্নান কর। গোরাচাঁদের পূজো ক'রে এস।

মহান্ত অকস্মাৎ হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আজন্ম-কুমার বৈরাগীর বুকের ক্ষুধা এতদিন ঘুমন্ত জনের ক্ষুধার মত অবিচলিত ছিল। আজ আহার্য্য সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলায় সে ক্ষুধা অজগরের গ্রাস বিস্তার করিয়া মাথা তুলিল। সে অজগর বাউলের আজন্ম-সাধনায় অর্জ্জিত বৈরাগ্যকে অসহায় বনকুরঙ্গের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাকে পিষিয়া মারিয়া সে তাহাকে নিঃশেষে গ্রাস করিবে। রসিকদাস শিহরিয়া উঠিল। সে যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার রসের উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শুক-সারীর দ্বন্দ্বের গান আর জমে না। গোষ্ঠ-বিহারের সুদাম-সুবলের সখা-সংবাদ আর সে গায় না। হাসে না, কাঁদেও না, সে এক অদ্ভুত অবস্থা। মধ্যে মধ্যে একা, অথবা নিশীথ-রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া, হাতজোড় করিয়া ডাকে, হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ! ধীরে ধীরে দুইটি নরনারীর জীবন কেমন একটা স্পন্দহীন গুমটে অসহনীয় হইয়া উঠিল। কমলেরও যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। একদিন সে বলিয়া ফেলিল; এ তো আর ভাল লাগে না মহান্ত।

মহান্ত চমকিয়া উঠিল। বিবর্ণ মুখে স্পন্দনহীন দৃষ্টিতে সে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমল বলিল, ঘর যে বিষ হয়ে উঠল! চল, কোথাও যাই।

গৃহত্যাগের নামে রসিক যেন একটু জীবন্ত হইয়া উঠিল। সেও বলিয়া উঠিল, তাই চল, তাই চল কমল। কোথায় যাবে বল দেখি?

বৃন্দাবন।

রসিকদাস শিহরিয়া উঠিল। বলিল, না না না। অন্য কোথাও চল, ব্রজের চাঁদকে এ মুখ আমি দেখাতে পারব না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার সে কহিল, জান কমল, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত গোরাচাঁদের মন্দিরে যাই নাই।

কমলের মরিতে ইচ্ছা করিল। আপনার পানে চাহিতেও যেন তাহার ঘৃণা বোধ হইতেছিল। সে মহান্তকেই প্রশ্ন করিল, আমার মাঝে কি এতই পাপ আছে মহান্ত?

রসিক সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। একান্ত অপরাধীর মত নত মস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। কমল চোখ মুছিতে মুছিতে আবার বলিল, বেশ, কোথাও গিয়ে কাজ নাই। চল, পথে পথেই ঘুরব আমরা।

আঃ! রসিকদাস যেন বাঁচিয়া গেল। পথে—পথে—পথে—পথে! সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তাই চল রাই-কমল, তাই চল। আজই চল। তাহার মনে হইল, পথের

ধূলার মধ্যেই কোথায় আছে যেন মুক্তি। ঘর নয় কুঞ্জ নয়, বিশ্রাম নয় অভিসার নয়, শুধু চলা।—চল, আজই চল।

কমল হাসিয়া বলিল, 'ওঠ্' বলতেই কাঁধে ঝুলি! ঘর-দোরের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো?

বাধা দিয়া রসিক বলিল, থাক্ থাক্, প'ড়ে থাক্ ঘর-দোর। ঘর যখন আর বাঁধব না, তখন ঘর বিক্রি ক'রে, ঘর সঙ্গে নিয়ে কি হবে? সখি, বৈরাগী বাউল—হতে হয় হারায়ে দু কূল।

কমল আর আপত্তি করিল না। সে বলিল, যা খুশি তোমার তাই কর মহান্ত।

পরাজিত বন্দী বৈরাগী মুক্তির আশায় কাঁধে ঝোলা লইয়া মাথায় বাঁধিল নামাবলী। দাড়িতে আজ আবার বিনুনি পাকাইতে পাকাইতে অভিসারের গান ধরিল।

দীর্ঘ দিন পর ঘর ছাড়িয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ রসিক হইয়া উঠিল যেন পিঞ্জরমুক্ত পাখি—প্রগাঢ় নীলিমার মধ্যে সঞ্চরমান, মুখর। রসিক পায়ে পরিয়াছে নূপুর; হাতের একতারাটিতে উঠিতেছিল অবিরাম ঝঙ্কার, সে নিজে গাহিয়া চলিয়াছিল গানের পর গান। দ্বিপ্রহরের সময় একখানা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের বাজারের মুখে পথের পাশে পুকুরের বাঁধা ঘাট দেখিয়া পথবিহারী নরনারী দুইটি ঘর পাতিল।

রসিক গাছতলা পরিষ্কার করিয়া উনান পাতিল, কাঠকুটা ভাঙিয়া সংগ্রহ করিল। তারপর ডাকিল, এস গো ঘরের লক্ষ্মী।

কমল স্নানান্তে আসিয়া বসিয়া একটু হাসিল। রান্নার

ব্যবস্থায় বসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ঝুলির ভাঁড়ারে যে নুন নাই গো ঘরের কর্ত্তা।

মহান্ত নুন আনিতে গেল। নুনের ঠোঙা হাতে ফিরিয়া দেখিল, কমলকে ঘিরিয়া দর্শকদের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে।

পরম কৌতুকে রসিকদাস দর্শকদের পিছনে দাঁড়াইল। দৃষ্টি পড়িল তাহার কমলের পানে। হাঁ, দেখিবার মত রূপ বটে। ভিজা এলোচুলের প্রান্তদেশ একটি গিঁট দিয়া ভাঁজ করিয়া মাথার উপর তোলা। আগুনের আঁচে সুন্দর মুখখানি সিন্দূরের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। নাকে রসকলি, কপালে তিলক জ্বলজ্বল করিতেছে। দর্শকদের সে দোষ দিতে পারিল না। দর্শকদের দল কিন্তু দেখিয়াই নিরস্ত ছিল না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ হইতেছিল।

প্রশ্নের কিন্তু জবাব ছিল না। কমল নীরবে মর্য্যাদাভরে গরবিণীর মত বসিয়া ছিল। কোন দিকেই যেন তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

একজন বার বার প্রশ্ন করিতেছিল, কি নাম গো বোষ্টুমীর? কোথা বাড়ি?

পিছন হইতে রসিক উত্তর দিল, নাম রাই-কমল। বাস রসকুঞ্জে।

কথার শব্দে পিছন ফিরিয়া সকলে এবার রসিকের দিকে চাহিল। কে একজন প্রশ্নও করিল, ও আবার কে হে?

রসিক কমলের পাশে আসিয়া সেই লতার লাঠিটা মাটিতে

ঠুকিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমার নাম খেঁটে-হাতে আয়ান ঘোষ গো প্রভু। বোষ্টুমীর বোষ্টম গো আমি।

দর্শকের দল খসিতে শুরু করিল।

কৌতুকে মহান্ত হাসিয়াই সারা হইল। নির্জ্জীব বৈরাগী আজ মুক্ত বায়ুর স্পর্শে যেন বাঁচিয়া উঠিয়াছে। আপনার মনে গুনগুন করিতে করিতে সে ডাকিয়া উঠিল, রাই-কমল!

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, তবু ভাল। কতদিন পরে আজ 'রাই-কমল' ব'লে ডাকলে।

ঘর-ছাড়ার কোন্ আনন্দে বৈরাগী আজ মাতোয়ারা, কে জানে! রসিকের শুষ্ক রসসাগর যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। স্মিত হাস্যে কৌতুকোচ্ছল চোখে সে বলিয়া উঠিল, তাই ভাল, তাই ভাল রাই-কমল, আজ মানই তুমি কর। গেরস্থের দোরে দোরে আজ আমি মানের পালা গাইব।

কমল হাসিল। হাসিয়া বলিল, গান তুমি গাইতে পার মহান্ত, কিন্তু মান তো ভাঙাতে পারবে না। নারীর সঙ্গ বাউল-বৈরাগীর পাপ, লজ্জা—সে তো তুমি ভুলতে পারবে না।

খুব জোরের সহিত বাউল বলিয়া উঠিল, খুব পারব গো রাই-মানিনী, খুব পারব। পাপ-লজ্জা ঘরের বস্তু, ঘরেই ফেলে এসেছি। তাই তো আজ আবার তুমি আমার রাই-কমল—কৃষ্ণপূজার কমল-মালা।

পথে পথে চলে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। গৃহস্থের দুয়ারে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়। পথের পর পথ, গ্রামের পর গ্রাম পিছনে

পড়িয়া থাকে। গঙ্গা অনেক পিছনে পড়িয়াছে। অজয়ের তীরে তীরে পথ।

চলিতে চলিতে মাস দুই পরে একদিন কমল পথের উপর চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কহিল, এ কোথায় এলাম মহান্ত?

রসিক চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া শুধু বলিল, রাই-কমল!

মায়ার টানে, না পথের ফেরে কে জানে, পথের মানুষ দুইটি এ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে?

ওই দূরে অজয়ের তীর। ঘন শরবন চলিয়া গিয়াছে কূলে কূলে। এই তো বনওয়ারীলালের রাসমঞ্চ।

বনওয়ারীলাল এখানকার প্রাচীন জমিদারের গোবিন্দ-বিগ্রহ। এই অঞ্চলে অজয়ের কূলে কূলে বনওয়ারীলালের লীলাক্ষেত্র তৈয়ারি করিয়া গিয়াছেন বনওয়ারীদেবের সেবাইত—রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, ঝুলন-কুঞ্জ। এখান হইতে ওই অনতিদূরে তাহাদের গ্রাম। ওই তো!

উভয়েই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কমল বলিল, ফেরো মহান্ত।

রসিক ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, না রাই-কমল। মা যখন টেনেছেন, গোবিন্দ যখন এনেছেন, তখন মায়ের কোলে ত্রিরাত্রি বাস না ক'রে ফিরব না।

তাহারা আসিয়া দাঁড়াইল রসকুঞ্জের দুয়ারে। দুয়ার বলিলে ভুল হইবে, রসকুঞ্জের ধসিয়া-পড়া ভিটার প্রান্তে। মনের কোণে

মমতা কোথায় লুকাইয়া ছিল, নয়ন-পথে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিল। চোখে জল আসিল।

কমলদের আখড়ার অবস্থাও তাই। তবে অটুট আছে শুধু জোড়ালতার কুঞ্জটি, আর চারিপাশের ঘন বেষ্টনীটি। কুঞ্জতলের রাঙামাটিতে নিকানো সেকালের সেই সুপরিচ্ছন্ন অঙ্গনটির উপর জাগিয়া উঠিয়াছে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। পথবাসী মানুষ দুইটি সেই ছায়াতলে বসিয়া পড়িল। অনির্ব্বচনীয় নিবিড় একটি মমতার মোহ তাহাদের মন ও চৈতন্যকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া উভয়ে চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকের সহিত আজ আবার যেন নূতন করিয়া পরিচয় করিয়া লইতেছে।

কতক্ষণ পর কমল বলিয়া উঠিল, বড় মায়া হচ্ছে মহান্ত। ফেলে যাবার কথা মনে করতেও কষ্ট হচ্ছে, মন যে থাকতে চাইছে।

রসিক তখন গান ধরিয়া দিয়াছে—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল
দেখা না হইত পরান গেলে।

কমলও তাহার সঙ্গে যোগ দিল। চোখ তাহার সজল হইয়া উঠিল। গানের শেষে মহান্ত বলিল, আর যাব না রাই-কমল। বাতাসে মাটিতে আমাকেও যেন জড়িয়ে ধরছে।

কমল নীরবে আমগাছটির দিকে চাহিয়া ছিল।

রসিক আবার বলিল, আমাকে কিন্তু রসকুঞ্জে থাকতে দিতে হবে।

তিক্ত হাসি হাসিয়া কমল বলিল, তাই হবে গো, তাই হবে, তোমার কুঞ্জেই তুমি থাকবে। ভয় নাই, ধ্যান তোমার ভাঙবে না।

মহান্ত বলিল, না গো, না। আসব আমি। শাঙনের বাদল-রাতে ঝুলনায় তোমায় দোল দিতে আসব। রাসের রাতে ফুলের গয়না নিয়ে তোমার দরবারে আসব আমি। ফাল্গুনের পূর্ণিমায় আসব ফাগ-কুঙ্কুম নিয়ে।

তীব্র ব্যঙ্গভরে হাসিয়া কমল বলিয়া উঠিল, একটি লীলা যে বাকি থাকল ঠাকুর—গিরি-গোবর্দ্ধনধারণ।

রসিক অপ্রতিভ হইল না। কহিল, ভুল করলে যে রাই-কমল। আমি তো সে হয়ে আসব না তোমার দরবারে রাই-মানিনী। আমি হব তোমার বৃন্দে, তোমার ললিতা, তোমার মালাকর, তোমার কুঞ্জদ্বারের দ্বারী। কটা দিনের কথা ভুলে যাও—হারিয়ে ফেল, মুছে দাও জলের আল্পনার মত।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, মালা কি সত্যিই ফাঁসি হয়ে গলায় লেগেছে মহান্ত যে, ছিঁড়তেই হবে?

দূর দূর, বাজে ব'কে শুধু সময় মাটি। বলি ওগো বোষ্টুমী, পেটের কথা ভাব। চল, দোরে দোরে দুটো মেগে আসি।

মহান্ত একতারায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

ম্লান হাসি হাসিয়া কমল বলিল, চল। কিন্তু শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায় মহান্ত ?

পথ চলিতে চলিতে কমল সহসা বলিয়া উঠিল, মহান্ত, আর একদিন এই কথাটাই তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আজ আবার জিজ্ঞেস করি—আমার মাঝে কি এতই পাপ আছে ?

মহান্ত পথ চলিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে হাতে বাজিতেছিল এক-তারা, পায়ে তালে তালে বাজিতেছিল নূপুর। একতারা নীরব হইয়া গেল, পায়ের নূপুর বাজিয়া উঠিল বেতালা। মহান্ত কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

হঠাৎ কমল দাঁড়াইল।

রসিকদাস বলিল, দাঁড়ালে যে ?

কমল আপনার অঙ্গের পানে চাহিল। চিকণ উজ্জ্বল ত্বক রৌদ্রের ছটায় ঝলমল করিতেছে নিখাদ সোনার মত। বুকের নিশ্বাসে তো কই কালি নাই—কোন গন্ধ নাই! তবে ? মন তাহার বলিয়া উঠিল, কোথায় পাপ ? কিসের পাপ ? সে আর মহান্তকে প্রশ্ন করিল না।

মহান্ত বলিল, কান্তুর বাড়ি আগে যাই চল।

কমল বলিল, না। তা হ'লে সে আর ছাড়বে না। সমস্ত গাঁ ফিরে শেষে তার বাড়ি যাব।

প্রথম গৃহস্থের দুয়ারে আসিয়া কমলই কহিল, বাজাও মহান্ত, একতারায় সুর দাও।

দুয়ারে দুয়ারে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া

ফেরে। গ্রামের জন তাহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে। মহান্ত গানেই উত্তর দেয়—

বল বল তোমার কুশল শুনি,
তোমার কুশলে কুশল মানি।

মেয়েরা কিন্তু ছাড়ে না। তাহারা তাহাদের কুশল শুনিয়া তবে ছাড়ে। কমলকে দেখিয়া স্মিত মুখে তাহারা বলিয়া উঠে, এ যে লক্ষ্মী-ঠাকরুণটি হয়েছিস কমলি—অঁ্যা!

নিজেরা দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, তাহাদের গৃহের মধ্যে কেহ থাকিলে তাহাকেও তাহারা ডাকে, দেখে যাও গো মাসী। আমাদের সেই কমলি এসেছে, দেখে যাও।

মাসী আসিয়া কমলকে দেখিয়া বলে, নবদ্বীপের জলের গুণ আছে। কমলের মুখ লজ্জিত স্মিত হাস্যে ভরিয়া উঠে। উত্তর দেয় রসিকদাস। সে বলিয়া উঠে, সে যে গোরাচাঁদের দেশ, রূপের সায়র গো। কৌতুকচপল পল্লীর মেয়েরা পরিহাস করিতে ছাড়ে না। তাহারা বলিয়া উঠে, তা বটে। তোমারও চেহারার জলুস হয়েছে দেখছি।

কথার শেষে তাহারা মুখে কাপড় দিয়া হাসে।

রসিকদাস কিন্তু অপ্রস্তুত হয় না। স্মিত মুখে সে জবাব দেয়, কাল যে কলি গো, নইলে শুকনো গাছেও ফুল ফুটত।

মুখের চাপা কাপড় ভেদ করিয়া এবার তরুণী-কণ্ঠের অবাধ্য হাসি উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে।

রসিকের কাছে পরাজয় মানিয়া এবার আবার তাহারা

কমলকে লইয়া পড়ে। জিজ্ঞাসা করে, কমলি, এখনও সোঁদা আছিস নাকি? তোর বোষ্টম কই লো?

রসিকদাসকে এবার লজ্জায় নীরব হইতে হয়। কমলই জবাব দেয় স্মিত মুখে, এই যে আমার মহান্ত।

মেয়েদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিতেই তাহারা কলস্বরে হাসিয়া উঠে। কেহ কেহ বলিয়া উঠে, কাল কলি হ'লে কি হবে মহান্ত, নামের গুণ যায় নাই। শুকনো গাছেও ফুল ফুটেছে।

মহান্ত অকারণে ব্যস্ত হইয়া উঠে। বলে, ভিক্ষে দাও গো। পাঁচ-দোর ঘুরতে হবে আমাদের।

রঞ্জনদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া মহান্ত বলিল, রাই-কমল, আজ আর থাক্। দুটো পেট এতেই চ'লে যাবে।

কমল বলিল, বাঃ, তাই কি হয়? আমার লঙ্কার বাড়ি না গেলে বলবে কি?

এতটুকু দ্বিধার লেশ সে কণ্ঠস্বরে ছিল না। মহান্ত সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। আনন্দোজ্জ্বল মুখ, সম্মুখপথে নিবদ্ধ দৃষ্টি কমলের। দুয়ারের পর দুয়ারে ভিক্ষা সারিয়া রঞ্জনদের দুয়ারে আসিয়া কমল বলিয়া উঠিল, মহান্ত, এ কি?

রঞ্জনদের বাড়িঘর সমস্ত একটা ধ্বংসস্তূপের মত পড়িয়া আছে।

মহান্ত ডাকিল, রাই-কমল!

কমল মুখ ফিরাইল, হাসিয়া বলিল, বল?

মহান্ত বলিল, ফিরি চল।

কমল হাসিয়া বলিল, চল।

পথে দাঁড়াইয়া ছিল একটি মেয়ে। সঙ্গে চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। সে অকস্মাৎ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, মাথা খাব তোমার, নাকে ঝামা ঘ'ষে দোব। এত দেমাক তোর কিসের লা? আমাকে হেনস্তা—কেন, কেন, শুনি?

কমল বলিল, কাহু!

কাহু আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কাহু কিসের লা? বল্ ননদিনী।

তারপর সহসা স্নেহকোমল স্বরে অনুযোগ করিয়া বলিল, এই তুপুর-রোদে কষ্মভোগ দেখ দেখি। বলি, আমি কি আজ খেতে দিতে পারতাম না? আয় আয়, জল খাবি আয়। এস গো মহান্ত। না, তুমি বুঝি আবার দাদা হয়েছ।—বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সাত

কাহু সমারোহের সহিত জলখাবারের আয়োজন করিয়াছিল। দাওয়ায় বসাইয়া সে নিজে পাখার বাতাস দিতে বসিল।

তারপর মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, শেষকালে এঁদো-পুকুরে ডুবে মলি ভাই বউ। ওই বগ-বাবাজী—বুড়ো খগের গলায় মালা দিলি?

কমল মুখ তুলিল, ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

সবিস্ময়ে কাহু বলিল, বউ!

লঙ্কা—আমার লঙ্কার বাড়ি—! কান্নার আবেগে কমলের কথা শেষ হইল না। চোখের কোল দুইটি তখন পরিপূর্ণ অশ্রুভারে উথলিয়া উঠিয়াছে।

দারুণ ঘৃণার সহিত কাহু বলিয়া উঠিল, তার নাম আমার কাছে করিস না। ছি-ছি-ছি!

কমল কিছু বুঝিতে পারিল না। কাহু আবার বলিল, পরীকে মনে আছে তোর? পরী বিধবা হ'ল তোরা এখান থেকে যাবার কিছু দিন পরেই। সেই পরীকে নিয়ে রঞ্জন দেশান্তরী হ'ল। রঞ্জনের বাবা, রঞ্জনের মা লজ্জায় ঘেন্নায় কাশী চ'লে গেল। সেইখানেই তারা মরেছে।

কমল মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। চোখের সম্মুখে তাহার মাটি যেন পাক খাইয়া ঘুরিতেছিল। তাহার বুকের মধ্যে তুফান বহিতেছিল। হায়, এত বড় বঞ্চনায় সে বাঁচিবে কি করিয়া?

কাহু বলিল, তার জন্যে দুঃখ করিস না বউ। সে যে তোর মোহ এড়িয়েছে, সেই তোর ভাগ্যি। তার বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর সে এখানে একবার এসেছিল বিষয় বিক্রি করতে। কি বললে আমাকে জানিস?

কমল মাটির দিকে চাহিয়া ছিল—মাটির দিকেই চাহিয়া

রহিল। কাহু বলিল, দেখলাম, রঞ্জন বোষ্টম হয়েছে। আমি একদিন ডেকে বললাম, আচ্ছা রঞ্জনদাদা, বোষ্টমই যদি হ'লে, তবে কমলকে দেশান্তরী করলে কেন ? তাকে তুমি ভুললে কি ক'রে ? আমায় উত্তর দিলে, কাহু, পরী খুব ভাল মেয়ে, তুমি জান না। আর সে ছেলেবেলার খেলাধূলোর কথা ছেড়ে দাও। বয়সের সঙ্গে তফাত হ'লেই সব ভুলে যেতে হয়।...ও কি, ও কি ভাই, কিছুই যে খেলি না! না না, একটা মণ্ডা অন্তত খা।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া কমল বলিল, রুচছে না ভাই ননদিনী, ননদিনীর দেওয়া মিষ্টি মুখে রুচছে না। তেতো নয়, বিষ নয়, ননদিনীর হাতের মিষ্টি কি মুখে ভাল লাগে! যে খবর দিয়েছিস, তাতেই পেট ভরেছে। তারপর গম্ভীরভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আজ থাক্ ভাই। পালাচ্ছি না তো। কত খাওয়াবি খাওয়াস পরে।

কাহু তাহার বুকের তুফানের সন্ধান পাইয়াছিল। সে আর জেদ করিল না। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিক্ষার ঝুলিটি মেলিয়া ধরিল। রহস্যের ভানে সে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

ভিক্ষার ঝুলিটি প্রসারিত করিয়া সে বলিল, ভিক্ষে পাই ননদিনী-ঠাকরুণ।

কাহুর কিন্তু চোখে জল আসিল। সে বেদনাভরেই কহিল, শেষ-ভিক্ষে তো দিয়েছি বউ, ননদিনীর কাজ তো করেছি।

কমল হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি এত ব্যর্থ, এত মেকী যে, তাহার নিজের চোখেই জল আসিল।

কান্থ বলিল, আমার কাছে লুকোচ্ছিস বউ? তা লুকোতে পারিস। আমাকে তা হ'লে তুই পর ভাবিস!

কমল তাহার হাত দুইটি ধরিয়া শুধু বলিল, কান্থ!

মুখরা কান্থর মুখে ম্লান সকরুণ হাসিটি বিচিত্র শোভায় ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, তা হ'লে তুই আর আমার কাছে তোর দুঃখ লুকোতে চেষ্টা করতিস না। মা হ'স নাই তুই বউ, নইলে বুঝতে পারতিস, খাঁটি ভালবাসায় মানুষের কাছে মানুষের কিছু গোপন থাকে না। কথা-না-ফোটা ছেলে কাঁদে। মা বুঝতে পারে, কোন্‌টা তার ক্ষিধের কান্না, কোন্‌টা রোগের কান্না, কোন্‌টা রাগের কান্না। চোখের জল তোর গাল বেয়ে ঝরল না, কিন্তু আমি যে বেশ দেখতে পাচ্ছি, সে জলে বুকের ভেতর তোর সায়র হয়ে গেল।

কমল নত মস্তকে এ তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইল। এতক্ষণে চোখের জল মুক্তধারায় পায়ের তলার মাটি সুসিক্ত করিয়া তুলিল।

রসিকদাস বাহিরে বসিয়া পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল। সে আবার বাহির হইতে সাড়া দিয়া উঠিল, ননদ-ভাজে এত গলাগলি কিসের গো?

কমল তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, যাই আমি ননদিনী।

কাহু বলিল, আজ এইখানে রান্নাবান্না কর্‌।

না, আজ নয়। বহুদিন পরে ভিটের কোলে ফিরে এলাম ভাই। আজ ভিটের মাটিতেই পাতা পেড়ে খাব।

কাহু আর আপত্তি করিল না।

লতামণ্ডপের তলদেশটিতে কমল সে দিনের মত গৃহস্থালী পাতিল। মহান্ত মুদীর দোকানে কয়টা জিনিস আনিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া দেখিল, ইটের উনান তৈয়ারি করিয়া ঝরা পাতার ইন্ধনে কমল ফুঁ পাড়িতেছে। মুখখানি রক্ত-রাঙা, চোখের জলে নিটোল গাল দুইটি চকচক করিতেছে।

মহান্ত যেন কেমন হইয়া গেল। কমলের বুকের উচ্ছ্বাসের সংবাদ তাহারও অজ্ঞাত ছিল না। একটা প্রবচন আছে, 'ছেলে কোলে মরে জলে ফেলব ; তবু না পোষ্যপুত্র দিব।' বৈরাগীর অন্তরের স্বামিত্বটুকু এমনই একটি ঈর্ষার আগুনে জ্বলিয়া মরিতেছিল। তাহার জিহ্বাগ্রে কয়টা কঠিন কথা আসিয়া পড়িল। সে বলিয়া ফেলিল, বলি, ও চোখের জল ধোঁয়ার, না মায়ার গো রাই-কমল ?

মুহূর্ত্তে আহতা ফণিনীর মত উগ্র ভঙ্গীতে কমল মুখ তুলিয়া মহান্তের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল। কিন্তু বিচিত্র রাই-কমল, দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির তীব্রতা তাহার কোথায় মিলাইয়া গেল! ছলছল চোখে, সকরুণ হাসি হাসিয়া কমল ধীরে ধীরে কহিল, মায়াই বটে মহান্ত।

মহান্ত বিষণ্ণ হাসি হাসিল, কোন উত্তর দিল না। কতক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমাকে বিদায় দাও তুমি।

কমল স্থির দৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, তারপর আবার মুখ নামাইয়া কাজে মন দিল।

মহান্ত কমলের হাত ধরিয়া অতি কোমল কণ্ঠে কহিল, রাই-কমল!

কমল হাতখানা টানিয়া লইল। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত প্রখর হাসি কমলের অধরে জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সে বলিল, আমার মধ্যে পাপ আছে মহান্ত।

অতি সুন্দর হাসি হাসিয়া মহান্ত বলিল, না না কমল। পাপ তোমার নয়, পাপ আমার। আমাকে বিদায় দাও তুমি।

কমল বলিল, না, আবার সে নীরবে উনানের ধূমায়মান আগুনে ফুঁ পাড়িতে লাগিল। সেই দিকে চোখ ফিরাইয়া মহান্ত এক সময় আপন মনেই গাহিতে লাগিল—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

গান থামাইয়া মহান্ত ডাকিল, কমল, রাই-কমল!

কমল সে আহ্বান গ্রাহ্য করিল না। মহান্ত হাসিমুখেই বলিল, বৈষ্ণবী একটা প্রাণের কথা শোন—

সখি, সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

আট

এই ঘর ভাঙিয়া বাউল ও বৈষ্ণবী একদিন পথে বাহির হইয়াছিল, সংকল্প ছিল, আর কখনও ফিরিবে না। আবার পথের ফেরে সেইখানে ফিরিয়া দুইটা দিন থাকিবার জন্য গাছতলায় সংসার পাতিয়াছিল। সে সংসার আর তাহারা ভাঙিতে পারিল না। কমল যেন বাসা বাঁধিতে বসিল। রসিকদাসও বলিল না, চল, বেরিয়ে পড়ি। কয় মাস না যাইতে ভাঙা ঘর পরম যত্নে তাহারা আবার গড়িয়া তুলিল। মায়ের কোলের মমতার জন্য, না, পথের বুকেও সুখ পাইল না বলিয়া, সে কথা তাহারাও হয়তো বেশ বুঝিল না।

পাশাপাশি দুইখানি আখড়া আবার গড়িয়া উঠিল। নীড়-রচনার সমারোহের মধ্যে দিনকয়েক বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। মহান্ত কাটিল মাটি, কমল বহিল জল, মহান্ত দিল দেওয়াল, কমল আগাইয়া দিল কাদার তাল। মহান্ত ছাইল চাল, কমল লেপিল রাঙা মাটি। মহান্ত বসাইল দুয়ার জানালা, কমল দুয়ার-জানালার পাশে পাশে রচনা করিল খড়ি ও গিরিমাটির আলপনা। নীড় সম্পূর্ণ হইল, সে নীড়ের দুয়ারে আবার অতিথি দেখা দিল। সেই পুরানো বন্ধু—ভোলা, বিনোদ, পঞ্চানন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের আসর বসে। তাহারা আনন্দ করিয়া চলিয়া যায়। কমল রাঁধিয়া বাড়িয়া ডাকে, মহান্ত!

মহান্ত তখন চলিয়া গিয়াছে। রসকুঞ্জে আসিয়া কমল বলিল, না খেয়ে যে চ'লে এলে ?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ ও অভিমান।

রসিক হাসিয়া বলিল, শরীর ভাল নাই কমল।

কমলের কণ্ঠস্বরের ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে আশঙ্কা-ভরে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল গো ? জ্বর-টর হবে না তো ? কই, দেখি, গা দেখি ?

কিন্তু নিত্যনিয়মিত ব্যাধি হইলে, সে ব্যাধির স্বরূপের সহিত মানুষের পরিচয় হইয়া যায়।

কয় দিন পর কমল সেদিন বলিল, দেহেই হোক আর মনেই হোক মহান্ত, ব্যাধি পুষে রাখা ভাল নয়। ব্যাধি তুমি দূর কর।

রসিকদাস শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমল বলিল, সেদিন তুমি বলেছিলে বিদায় দাও। সেদিন পারি নাই। আমার যা হবে হোক মহান্ত, তোমাকে আমি বিদায় দিচ্ছি।

রসিক চমকিয়া উঠিল, বলিল, এ কথা কেন বলছ কমল ?

ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া কমল বলিল, ব্যাধি তো তোমার আমি মহান্ত। ব্যাধিকে বিদায় করাই ভাল।

রসিক মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পর সে ডাকিল, কমল, রাই-কমল !

জনহীন প্রাঙ্গণ নিথর পড়িয়া, কমল বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। কথাটি বলিয়া সে আর অপেক্ষা করে নাই।

পরদিন হইতে রসিকদাস যেন উৎসব জুড়িয়া দিল। মুখে তাহার হাসির মহোৎসব—আখড়ায় গানের মহোৎসব। ভোলা আসিলে মহান্ত আহ্বান করে, এস ভোলানাথ, গাঁজা তৈরি। ভোলা পরমানন্দে বলে, লাগাও মহান্ত, দম লাগাও।

কলরবের স্পর্শ পাইয়া কমলও মুখর হইয়া উঠে। ভোলার তৎপরতা দেখিয়া তাহার হাসি উচ্ছল হইয়া ভাঙিয়া পড়ে। পঞ্চানন আসিলে সে বলিয়া উঠে, তুমি নাম-গান কর পঞ্চানন। —বলিয়া সে নিজেই গান ধরিয়া দেয় বাউলের সুরে—

গাঁজা খেয়ে বিভোর ভোলা—
পঞ্চাননে গায় হরিনাম—পঞ্চানন—ভোলা।

ভোলা ধরে খোল, মহান্ত করতাল লইয়া দোহারকি করে। দেখিতে দেখিতে কীর্ত্তন জমিয়া উঠে। এমনই করিয়া আবার দিনকয়েক বেশ কাটিয়া গেল। সেদিন কমল ভোলাকে বলিল, ভোলা, দুখানা কাঠ কেটে দে না ভাই।

ভোলা কুড়ুল লইয়া মাতিয়া উঠিল। কাঠ কাটিয়া ভোলা বলিল, মজুরি দাও কমল।

এখন কুলের সময় নয় রে ভোলা, নইলে কুলের ঢেলা ছুঁড়ে মজুরি দিতাম। কথাটা শেষ করিয়া কমল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, মনে পড়ে তোর?

ভোলাও হাসিল। বলিল, খুব।

রাত্রিতে নাম-কীর্ত্তনের আসর ভাঙিয়া গেল। সকলে চলিয়া

গেলে ভোলা তামাক সাজিতে বসিল। মহান্ত খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল। ভোলা তখনও তামাক টানিতেছিল।

মহান্ত বলিল, ভোলানাথ, এস।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভোলা পরম ঔদাস্যভরে বলিল, বসি আর একটু।

কিছুক্ষণ পর মহান্ত আবার ফিরিয়া আসিল, আমার কলকেটা? কলকে লইয়া মহান্ত কমলকে বলিল, রাত অনেক হ'ল রাই-কমল।

উত্তর হইল, জানি মহান্ত।

মহান্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই।

কমল এবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, ফুল মাথায় তোলবার আগে তাতে পোকা আছে কি না বেছে নিতে হয় মহান্ত। নইলে শিরে দংশন যদি হয়, তাতে আর ফুলেরই বা কি দোষ, পোকারই বা কি দোষ!

ফুল তো—। কথাটা বলিতে গিয়া মহান্ত থামিয়া গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই একমুখ হাসিয়া সে বলিল, গোবিন্দের নির্ম্মাল্য রাই-কমল, তাতে কীটই থাক্ আর কাঁটাই থাক্, মাথা ভিন্ন রাখবার আর ঠাঁই নাই আমার।

কমল বলিল, কালি মাখিয়ে সাদা ঢাকা যায় মহান্ত। কিন্তু কালি মাখিয়ে আলো ঢাকা যায় না। ফুল তুমি নিজে মাথায় তোল নাই, সে কথা একশো বার সত্যি। আজ তোমায় জোড়-হাত ক'রে বলছি, আমায় রেহাই দাও।

মহান্ত কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভোলা গাঁজা খাইয়া বম হইয়া বসিয়া ছিল। কমল ভোলাকে কহিল, বাড়ি যা ভাই ভোলা।

ওদিকে রুদ্ধ ঘরের মধ্যে মহান্ত প্রৌঢ় বাউল, অন্তরবাসী গোবিন্দের পায়ে মাথা কুটিতেছিল, গলার মালা আমার মাথায় তুলে দাও প্রভু, মাথায় তুলে দাও।

কিছুক্ষণ পরে উন্মত্তের মত নির্জ্জন ঘরখানি মুখরিত করিয়া বলিয়া উঠিল, না না, আমায় রূপ দাও। শ্যামসুন্দর, আমায় সুন্দর ক'রে দাও। আমার সাধনা-পুণ্য সব নাও।

উন্মত্ততার মধ্যে এই একান্ত কামনা জানাইয়া সে শয়ন করিল।

প্রভাতে তখন তাহার সে উন্মত্ততা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দুরাশার মোহ যেন কাটে নাই, প্রভাতের আলোকে আপনার অঙ্গপানে সে চাহিয়া দেখিল। তাহার সেই কুরূপ তাহার একান্ত প্রত্যাশিত দৃষ্টিকে উপহাস করিল।

পরদিন সমস্ত দিনটা সে কমলের আখড়া দিয়া গেল না। কি তাহার মনে হইল, কে জানে, বাহির করিয়া বসিল বাউলের পথ-সম্বল বড় ঝুলিটা। কয়টা স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে রঙিন কাপড়ের তালি দিতে বসিল।

ভোলা আসিয়া ডাকিল, কমল ডাকছে মহান্ত, এখনই চল।

মহান্ত গাঁজার পুরিয়া বাহির করিয়া দিয়া বলিল, তোয়ের কর।

কমলের আজ্ঞাপালনের তাগিদ ভোলানাথ ভুলিয়া গেল। গাঁজা খাইয়া সে কথা তাহার মনে পড়িল। সে ডাকিল, এস।

কাঁধে ঝোলাটা ফেলিয়া মহান্ত উঠিল। কিন্তু পথে বাহির হইয়া বিপরীত মুখ ধরিয়া সে বলিল, কমলকে ব'লো, আমি ভিক্ষায় বেরুলাম।

ভোলা অবাক হইয়া বলিল, যাঃ গেল, গাঁজাখোরের রকমই এই।

সন্ধ্যায় আখড়াটা সেদিন কেমন ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল। প্রদীপের আলোকে আড্ডার লোক কয়টি বসিয়া গল্প করিতেছিল। কমল ঘরের মধ্যে শুইয়া আছে। কীর্ত্তনের আসর আজ বসে নাই। রসিকদাস আসিয়া বলিল, এ কি ভোলানাথ, কীর্ত্তনের আসর খালি যে?

ভোলা বলিল, বোষ্টুমীর অসুখ। মাথা ধরেছে।

বোষ্টম তো আছে, এস এস।

রসিকদাস মৃদঙ্গটা পাড়িয়া বসিল। কিন্তু তবুও আসর জমিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই আসর শেষ হইয়া গেলে মহান্ত আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, রাই-কমল!

কমল নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল—কোন উত্তর করিল না। বিছানার পাশে বসিয়া মহান্ত আবার ডাকিল, কমল! রাই-কমল!

আমার মাথা ধরেছে মহান্ত।

কমলের ললাটখানি স্পর্শ করিয়া মহান্ত বলিল, মাথায় হাত বুলিয়ে দোব রাই-কমল ?

রুদ্ধস্বরে কমল বলিয়া উঠিল, না না না। তোমার পায়ে পড়ি মহান্ত। আমায় রেহাই দাও।

বহুক্ষণ নীরবতার পর মহান্ত ধীরে ধীরে বলিল, পারছি না রাই-কমল। আজ গোবিন্দের মুখ মনে ক'রে পথে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদূর না যেতেই গোবিন্দের মুখ ভুলে গেলাম। মনে পড়ল তোমার কমল-মুখ। হাজার চেষ্টা ক'রেও শ্রীমুখ মনে আর এল না।

কমল বলিল, এত বড় পাপ আমার মধ্যে আছে যে, আমার মুখ মনে করলে গোবিন্দের মুখ মনে পড়ে না মহান্ত ?

মহান্ত নতমুখে বসিয়া রহিল। কমল বলিয়া গেল, তোমার আগুনে তুমি কতটা পুড়লে তা জানি না মহান্ত; কিন্তু পুড়ে মলাম আমি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মহান্ত উঠিয়া চলিয়া গেল।

কমল উঠিল পরদিন সকালে। সংকল্প লইয়া শয্যাত্যাগ করিল, মহান্তের হাতেই আজ নিঃশেষে নিজেকে তুলিয়া দিবে। আর সে পারে না; এ আর তাহার সহ্য হইতেছে না। দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিতেই তাহার নজরে পড়িল, রঙিন কাপড়ে বাঁধা ছোট্ট একটি পোঁটলা দরজার পাশেই কেহ যেন রাখিয়া

দিয়া গিয়াছে। একটু ইতস্তত করিয়া সেটি তুলিয়া লইয়া সে খুলিয়া ফেলিল। লাল পদ্মের পাপড়ির শুকনো একগাছি মালা। মালাগাছি হাতে করিয়া সে নীরবে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা অগ্রসর হইয়া চলিল। ভোলা আসিয়া তামাকের সরঞ্জাম পাড়িয়া বসিল। তামাক সাজিতে সাজিতে সে প্রশ্ন করিল, কই, মহান্ত গেল কোথা? আখড়ায় তো নাই!

কমল বলিল, জানি না।

তামাক খাইয়া ভোলা উঠিয়া গেল, আসর জমিল না।

স্নানের সময় কাহু আসিয়া ডাকিল, বউ!

সচকিতের মত উঠিয়া কমল বলিল, চল যাই।

ঘড়া গামছা লইয়া সে কাহুর সঙ্গে চলিল। কাহু প্রশ্ন করিল, ওটা আবার কি বউ, রঙিন কাপড়ে জড়ানো?

কমল বলিল, মালা। জলে বিসর্জ্জন দিয়ে আসব ভাই।

কাহু বিস্মিতের মত কমলের মুখের উপর চাহিয়া রহিল। কথাটা সে বুঝিতে পারিল না। কমল বলিল, মহান্ত কাল রাত্রে চ'লে গেছে ননদিনী। এ মালা আমি তার গলায় দিয়েছিলাম।

কাহু বলিল, ছিঃ, মহান্তকে আমি ভালমানুষ মনে করতাম। তার—

কমল বাধা দিল, কহিল, না না। তুই জানিস না ননদিনী। তুই জানিস না। চোখে তাহার জল আসিল। চোখ মুছিয়া আবার বলিল, তা ছাড়া সে আমার গুরু, তার নিন্দে আমায় শুনতে নাই।

নীরবে পথ চলিতে চলিতে কমল আবার বলিল, তোর সংসারের লক্ষ্মীর কৌটো যদি কেউ সিঁদ কেটে চুরি করে কাহু, তবে সে ঘরে সংসার পাততে কি সাহস হয়, না মন চায়?

কাহু বলিয়া উঠিল, ওসব কি অলুক্ষণে কথা বলিস তুই বউ—ছিঃ!

কমল হাসিয়া বলিল, বাউলের সংসারের গৃহদেবতা চুরি গিয়েছে ননদিনী।

আবার কিছুক্ষণ পর সে বলিল, সে পাক, তার শ্যামকে সে ফিরে পাক।

নয়

ইহার পর কমল যেন আর এক কমল হইয়া উঠিল। মহান্ত চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান সে করিল না। কাহাকেও করিতেও বলিল না। কেহ তাহাকে বারেকের জন্যও বিষণ্ণ হইয়া থাকিতে দেখিল না। রাত্রে ঘুমাইয়া কাঁদে কি না, সে কথা ভগবান জানেন। সকালে উঠে কিন্তু সে হাসিমুখ লইয়া, সে হাসি অহরহই তাহার মুখে লাগিয়া থাকে। সামান্য কারণে হাসিয়া সে যেন ভাঙিয়া পড়ে। কথায় কথায় গান ধরিয়া দেয়। হাসিতে গানে উল্লাসে, সে যেন উথলিয়া উঠিল। দেহ-লাবণ্যের মার্জ্জনবিন্যাস আরও বাড়িয়া উঠিল। কোঁকড়া-কোঁকড়া ফুলো-ফুলো একপিঠ চুল তাহার। সে চুল সে পরিপাটি বিন্যাস

করিয়া রাখালচূড়া বাঁধে। ঈষৎ বাঁকা নাকটির সুবঙ্কিম মধ্যস্থলেই শুভ্র তিলক-মাটি দিয়া একটি সূক্ষ্ম রসকলি আঁকে। তাহারই ঠিক উপরেই কালো রেখা দুইটির মধ্যস্থলে সযত্নে তিলক-মাটিরই একটি টিপ পরে। গলায় থাকে দুকণ্ঠী মিহি তুলসীকাঠের মালা। দেখিয়া দেখিয়া ভোলা বলে, শোভা কি মালার গুণে, শোভা হয় গলার গুণে।

ঘাড়টি দুলাইয়া কমল মৃদু মৃদু হাসে।

আখড়ার সেই উৎসব-সমারোহ যেন বাড়িয়া গিয়াছে। ভোলা আসে, বিনোদ আসে, পঞ্চানন আসে, আরও অনেকে আসে। দিনে দিনে তাহাদের দলবৃদ্ধি হয়। কিশোর যাহারা তাহাদের কেহ আখড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলে কমল তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়। প্রৌঢ়েরা কেহ দুই-চারিদিন আখড়ার সুমুখ দিয়া আনাগোনা করিলে পঞ্চম দিনে কমল তাহাকে ডাকে, এস মোড়ল, পায়ের ধূলো দিয়ে যাও। সন্ধ্যায় কমল গান ধরে, অপর সকলে দোহারকি করে। প্রহরখানেক রাত্রে আখড়া ভাঙে। কমল বলে, এইবার বাড়ি যাও সব ভাই। সবাই উঠি উঠি করে, কিন্তু কেহই যাইতে চায় না। কমল একে একে হাত ধরিয়া আখড়ার বাহিরে পথের উপর আনিয়া বলে, কাল সকালেই ঠিক এসো যেন। বাড়ি ফিরিয়া কমল ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। কিছুক্ষণ পর ভোলা ডাকে, কমলি! কমলি! কাহারও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কোন কোন দিন সাড়া মেলে ঘরের মধ্য হইতে। কমল বলে, তুই আবার কিসে এসেছিস?

ভোলা বলে একবার তামাক খাব ভাই, দেশলাইটা দে।

উত্তর আসে, বাড়িতে—বাড়িতে তামাক খেগে যা। বউ সেজে দেবে।

ভোলা ডাকে, কমল!

কমল বলিয়া উঠে, দেখেছিস বঁটি, আমায় বিরক্ত করবি তো নাক কেটে দোব। যা বলছি, বাড়ি যা। তোর বউয়ের, তোর মায়ের গাল খেতে পারব না আমি।

সত্যই ভোলার মা, শুধু ভোলার মা কেন, গ্রামের গৃহস্থজন সকলেই কমলকে গালাগালি দেয়। বলে, ছি! এই কি রীত-করণ? রঞ্জনকে দেশছাড়া করলে, মহান্তকে তাড়ালে, আবার কার মাথা খায় দেখ। যাকে দশে বলে, ছি, তার জীবনে কাজ কি?

সমস্তই কমলের কানে পৌঁছায়, লোকে স্বল্প দূরত্ব রাখিয়া সমস্তই তাহাকে শুনাইয়া বলে। এ ঘাটে কমল স্নান করে, কথা হয় পাশের ঘাটে। কমল পথ চলে, পিছনে থাকিয়া লোকে কথা বলে। কমল পিছনে থাকিলে তাহার আগে থাকিয়া লোকে ওই কথা বলিয়া পথ চলে।

কমলের হাসিমুখ আরও খানিকটা হাসিতে ভরিয়া উঠে। সেদিন ভোলার মা তাহাকে ডাকিয়াই বলিল, মর্ মর্, তুই মর্।

কমল হাসিল, বলিল, মনুষ্যজন্ম বহু ভাগ্যে হয়েছে, সাধ ক'রে কি মরতে পারি, না, মরতে আছে!

ভোলার মা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কমল কথা না বাড়াইয়া হাসিমুখেই চলিয়া গেল।

ভোলার মা পিছন হইতে আবার ডাকিল, শোন্, শোন্।

কমল বলিল, মাখন মোড়লের নতুন জামাই এসেছে খুড়ীমা, জামাই দেখতে যাচ্ছি, পরে শুনব।

মাখন মোড়লের বাড়িতে নূতন জামাইয়ের আসর হাসিতে গানে রসিকতায় গুলজার করিয়া দিয়া হঠাৎ সন্ধ্যার মুখে সে উঠিয়া পড়ে।

জামাই বলে, সে কি, এর মধ্যে যাবে কি ঠাকুরঝি? এই সন্ধ্যে লাগল।

কমল হাসিয়া বলে, আমার যে আয়ান ঘোষের একটি দল আছে ভাই শ্যামচাঁদ। ফিরতে দেরি হ'লে ঘর-দোর ভেঙে তছনছ ক'রে দেবে হয়তো।

ব্যাপারটা চরমে উঠিল একদিন। গ্রামের নগদী আসিয়া বলিল, পান আছে বোষ্টুমী? গোটা পান চাইলে গোমস্তা। জমিদার এসেছেন, পান আনতে ভুল হয়েছে। গোটা পান দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াও, তাহার কি মনে হইল, সে পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসিল। একখানি ঝকঝকে রেকাবিতে পানের খিলিগুলি সাজাইয়া পাশে একটু চুন, কিছু কাটা সুপারি রাখিয়া হাসিমুখে সে কাছারিতে গিয়া হাজির হইল। রেকাবিটি সামনে নামাইয়া রাখিয়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল। জমিদার সবিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া

রহিলেন। কমল হাসিয়া বলিল, আমি আপনার প্রজা—কমলিনী বোষ্টুমী। নগদী গেল গোটা পানের জন্যে। পান কি পুরুষ-মানুষে সাজতে পারে! তাই সেজে আনলাম।

জমিদার একটা পান তুলিয়া মুখে দিয়া বলিলেন, বাঃ! কেয়ার গন্ধ উঠছে দেখছি!

কমল হাসিয়া বলিল, আপনার পান এলে পাঠিয়ে দেবেন, আমি সেজে দোব।

সে জমিদারকে আবার একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতে-ছিল। জমিদার বলিলেন, পান সেজে তুমি দিয়ে যাবে কিন্তু।

কমল হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমি ?

হ্যাঁ। তোমার পান যেমন মিষ্টি, হাসি তার চেয়েও মিষ্টি। গানও নাকি তুমি খুব ভাল গাও শুনেছি।

বৈষ্ণবী তাহার ঘোমটা ঈষৎ একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিল, ভিখিরীর ওই তো সম্বল প্রভু। জমিদারকে সে গান শুনাইল।

আশ্চর্য্যের কথা, সেই দিন সন্ধ্যায় তাহার আখড়ায় কেহ আসিল না। ভোলাও না।

কমল ঠাকুরঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিল।

দিন কয়েক পর।

জমিদার চলিয়া গিয়াছেন ভোররাত্রে। সকালবেলাতেই গ্রামখানা উচ্চ চীৎকারে মুখরিত হইয়া উঠিল। কোথায় কলহ বাধিয়াছে।

কলহ বাধিয়াছে কাহুর সঙ্গে ভোলার মায়ের। কাহু অনেক দিন হইতেই কমলের সম্পর্কে লোকে কটু কথা বলে শুনিয়া আসিতেছিল, শুনিয়া সে জ্বলিয়া যাইত। কমল তাহাকে বলিত, ছি! লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে নাই। আজ জমিদার চলিয়া যাইতেই লোকে ওই পান দেওয়া এবং গান গাওয়া লইয়া নানা কথা কহিতে শুরু করিয়াছে ভোরবেলাতেই। ঘাটে কাহু সেই কথা লইয়া ঝগড়া বাধাইয়াছে। সে আর সহ্য করিতে পারে নাই।

একা ভোলার মা নয়, বিনোদ-পঞ্চাননের মাও ছিল। আরও ছিল দুই-চারিজন স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী। কিন্তু কাহুর জিহ্বা ও কণ্ঠের তীব্রতার কাছে তাহাদিগকে হার মানিতে হইল। সত্য সত্যই এ যেন লঙ্কাকাণ্ড, কি কুরুক্ষেত্র। কাহুর এক নিক্ষেপে 'লক্ষ বাণ ধায় চারিভিতে'।

কমল আসিয়া কাহুকে টানিয়া লইয়া গেল আপনার বাড়ি। কহিল, ছি!

কাহু উগ্রভাবেই বলিল, ছিঃ? 'ছি' কেন শুনি? যে চোখ সংসারে খারাপ বই দেখে না, তার মাথা খাব না? তাদের জিভ খ'সে যাবে না?

কমল হাসিল। বলিল, বলুক না।

না। বলবে কেন? কেন বলবে শুনি? কোন্ চোখ-খাগীর—? সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কমল বলিল, আমার মাথা খাবি।

কাহু বলিল, তোর মাথা খাব না ভেবেছিস? তোর মাথাও খাব। জাঁতি দিয়ে তোর চুলের রাশ কাটব, ঝামা দিয়ে নাকের রসকলি তুলব, তবে আমার নাম ননদিনী।

কমল হাসিয়া বলিল, তাই আন্। পরের সঙ্গে কেন বাপু?

কাহু ও কথায় কান দিল না। সে কমলের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধ নেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল, দেখ দেখি, এই রূপে চোখখাগীরা কু দেখে? তাদের চোখের মাথা খাব না? এ রূপ গেলে দেখব কি? পোড়ামুখীদের কালো হাঁড়িমুখ, না পোড়াকাঠ?

কমল ননদিনীর গালে একটি টোকা মারিয়া বলিল, আবার? তারপর সে মৃদুকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাখা,
কালসাপিনী-জিহ্বা যেন বিষে আঁকাবাঁকা।
আমার দারুণ ননদিনী—

কাহু একটু হাসিল। কমল বলিল, ছিঃ কাহু, মানুষকে কি ওই সব বলে?

কাহু বলিল, তবে কি বলব শুনি? শ্রীমতী কি বলতে বলেন, শুনি?

কমল আবার মৃদুস্বরে গাহিল—

ননদিনী ব'লো নগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।

কাহু বলিল, তবে আর গালাগালি দিই কি সাধ ক'রে বউ? ওরা যে তা বিশ্বাস করবে না। বলে, তাই নাকি হয়?

কথাটা হইতেছে এই—কমল এবার সংকল্প করিয়াছিল যে, আর মানুষ নয়, এ রূপে সে এবার শ্যামসুন্দরের পূজা করিবে। বহু ইতিকথা তো সে শুনিয়াছে। তাই সে রাত্রে আখড়া ভাঙিয়া গেলে মালতী বা মাধবীর মালা গাঁথে, সুশোভিত কাঠের সিংহাসনে স্থাপিত কৃষ্ণমূর্ত্তির পটখানির গলায় পরাইয়া দেয়। অনিমেষে পটের দিকে চাহিয়া থাকে—যদি সে মূর্ত্তি হাসে। মাথার উপর ঘৃতদীপ ধরিয়া সে পটের আরতি করে। তাই রাত্রে আখড়া ভাঙিবার পর ভোলা যখন ডাকিত, 'কমল', পূজারতা কমলের সে কথা কানে যাইত না বা উত্তর দিবার অবসর থাকিত না। পূজায় বসিবার পূর্ব্বে হইলে বলিত, তোর নাক কেটে দোব ভোলা।

এটুকু জানিত শুধু ননদিনী কানু।

আজ কানুর কথার উত্তরে কমল বলিল, আমার একটি কথা রাখতে হবে বউ।

কানু বুঝিয়াছিল, কথাটা কি। সে হাসিয়া বলিল, রাখব। কিন্তু আমারও একটা কথা রাখতে হবে তোকে।

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ছেলেবয়েসের সাথী-সখার দল—কি ক'রে বলব কানু, যে, এসো না তোমরা?

কানু তাহার হাত ধরিয়া বলিল, তোর কলঙ্ক আমার সহ্য হয় না বউ। তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল।

বহুক্ষণ পর কমল বলিল, তাই হবে ননদিনী। সেই ভাল।

পটের পায়ে ডুবতে হ'লে ভাল ক'রে ডোবাই ভাল। সঙ্গী সাথী ডেকে হাত বাড়িয়ে তুলতে বলা কেন? তাই হবে।

কাহু বলিল, ননদিনীর জিভও কাটা গেল বউ আজ থেকে।

এর পর কমলের জীবনে এক নূতন অধ্যায়।

পটের পূজায় সে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করিল। কমলের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ননদিনী পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সে একদিন বলিল, একটা কথা বলব বউ?

কি?

রাগ করবি না তো?

কমল কোন উত্তর দিল না, শুধু হাসিল। কাহু উত্তর পাইয়াছিল, সে ভরসা করিয়া বলিল, এ পথ ছাড়্ ভাই বউ; তুই পাগল হয়ে যাবি।

কমলের মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল, আমার আশার ঘর তুই ভেঙে দিস না ভাই।

কাহু কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর কহিল, ভগবান বড় নিষ্ঠুর ভাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমল বলিল, অতি নিষ্ঠুর ননদিনী, অতি নিষ্ঠুর।

ছবির পূজায় দীর্ঘ দুইটি বৎসর তাহার কাটিয়া গেল, কিন্তু মূক ছবি মূকই রহিয়া গেল। কোন দিন তো সে হাসিল না, স্বপ্নেও কোন দিন সে দেখা দিল না! কল্পনায় একটি কিশোর

মূর্ত্তি মনে করিতে গেলে ফুটিয়া উঠে চঞ্চল কিশোর সখার রূপ। কমল শিহরিয়া উঠে। সহসা আজ তাহার মনে হইল, পট না হাস্থক, কিন্তু যুগযুগান্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠা-করা বিগ্রহ তো আছে।

কান্থ বলিল, তুই মালা-চন্দন কর্ ভাই বউ। তোদের তো আছে।

কমল বলিল, না, আমার আশা আজও যায় নাই ননদিনী। আমি মন্দিরে মন্দিরে তাকে খুঁজে দেখব।

কান্থ আর কিছু বলিতে পারিল না।

ইহার পর হইতে কমল গ্রামে গ্রামান্তরে তীর্থে তীর্থে বিগ্রহ-মূর্ত্তির দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। প্রাণ-ঢালা গানের নৈবেদ্যে সে দেবতার পূজা করিত, প্রাণের আবেদন শুনাইত, অপলক নেত্রে বিগ্রহ-মূর্ত্তির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, যদি ঈষৎবিকশিত চোরাহাসিটি পলকের অন্ধকারে চোখ এড়াইয়া মিলাইয়া যায়।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চোখ জলে ভরিয়া আসে। তখন আর সে পলক না ফেলিয়া পারে না। চোখের জল তাহার গণ্ডদেশ বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে।

দশ

এমনই করিয়া কাটিয়া গেল কতদিন—পরিপূর্ণ দুইটি বৎসর।

পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন স্নানের সময় ননদিনী কমলের দুয়ার খোলা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ দিনে তো পোড়ারমুখী বউ কখনও ঘরে থাকে না! সংক্রান্তির দিন গঙ্গাস্নান করিয়া বনওয়ারীবাদে বনওয়ারীলালের দরবারে তাহার যাওয়া চাইই। কাদুর আশঙ্কা হইল। কমলের অসুখ করিল নাকি? সে আগড় ঠেলিয়া আখড়ায় প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বউ!

কমল তখন স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে উত্তর দিল, যাই।

কাদু প্রশ্ন করিল, তোর শরীর ভাল তো?

কলসী কাঁখে লইয়া কমল বাহিরে আসিল। খোলা হাত-খানি কাদুর মুখের কাছে নাড়া দিয়া বলিল, বলি, ও ওলো ননদী, আজকে হঠাৎ হ'লি যে তুই এমন দরদী? হঠাৎ শরীরের খবর যে?

তবে যে বড় বনওয়ারীলালের দরবারে যাস নাই? নাগরের ডাক হেলা ক'রে বেলা খোয়াচ্ছিস যে?

যাব না।

কেন?

মান করেছি।

মান! কাহ্ন একান্ত দুঃখের সহিতই হাসিল। তারপর বলিল, মান ভাঙাবে কে কমল?

কমল স্বপ্নপ্রবণ চোখে আকাশপানে চাহিয়া রহিল। কাহ্ন বলিল, বউ, মিছে দেহপাত করিস না। ও হবার নয়।

কমল বোধ হয় কোন স্বপ্ন-কল্পনা করিতে করিতেই পথ চলিতেছিল, কোন উত্তর না দিয়া এতক্ষণে স্থির দৃষ্টি কাহ্নর মুখের উপর রাখিয়া চাহিয়া রহিল। কাহ্ন বলিল, এমন ক'রে চেয়ে থাকিস না ভাই। তোর ওই চাউনিকে আমার বড় ভয় করে।

কমল তবু হাসিল না। স্নান করিতে করিতে কাহ্ন হাসিয়া বলিল, তার চেয়ে বউ, আমায় তোর শ্যাম মনে কর্। আমি তোকে বুকে ক'রে রাখব।

কমলের নগ্ন সুন্দর বুকে সে আঙুলের একটি টোকা মারিল। সে তখন দুই হাতের আঘাতে আঘাতে জলের হিল্লোল তুলিতে তুলিতে গাহিতেছিল, 'সাগরে যাইব কামনা করিব সাধিব মনেরই সাধা'। ফিরিবার পথে কমল অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তাই ভাল ননদিনী।

কি?

তোকেই আমার শ্যাম করব।

মর্।

সন্ধ্যেতে আসিস ভাই। একলা আজ থাকতে পারব না।

তুই যাস ভাই। ছেলেপিলের খাওয়া-দাওয়া, চ্যা-ভ্যাঁ, সন্ধ্যেতে আমার আসা হবে না।

আচ্ছা যাব। নন্দাই কিছু বলবে না তো?

খিলখিল করিয়া হাসিয়া কাদু বলিল, তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। নয়তো রাম মোড়লের মজলিসে তামাক খেতে পাঠিয়ে দোব।

কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু দ্বিপ্রহর না যাইতেই কমল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল জয়দেবের কথা। জয়দেবের শ্যামচাঁদের দরবারে সে কখনও তো যায় নাই! জয়দেবের শ্যাম প্রেমের ঠাকুর। জয়দেবের কাহিনী মনে করিয়া সে আশান্বিত হইয়া উঠিল। ননদিনীকে চাবি দিয়া তুলসী-মন্দিরে প্রদীপ দিবার কথা বলিবারও তাহার অবসর হইল না।

বহুদূর পথ, ক্রোশ পঁচিশেকের কম নয়। কমল স্থির করিল, দিন রাত্রি চলিয়াও সে আগামী কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোনরূপে পৌঁছিবেই।

কমল একাই পথ ধরিল। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া সে চলিয়াছিল। পথে যাত্রীর দল পাইবে, সে আশা করিয়াছিল। কিন্তু যাত্রীরা সব পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার মুখে একখানা গ্রাম পার হইবার সময় সে শুনিল, সম্মুখে একখানা মাঠ পার হইয়াই আর একখানি গ্রাম, তারপরই জয়দেবের আশ্রম।

মাঠখানা একটু বিস্তীর্ণ। ক্রোশ দুই হইবে। কমল মাঠের বুকে নামিয়া পড়িল। সদ্য-ফসল-কাটা শুভ্র ক্ষেতগুলিকে বেড়িয়া বেড়িয়া পায়ে-চলা পথের নিশানা ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। শুক্লপক্ষের রাত্রি। দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত স্তর-মেঘের মেলা আকাশ ছাইয়া থাকিলেও মেঘের আড়ালের দশমীর চাঁদের জ্যোৎস্নার আভায় ধরিত্রীর বক্ষ অস্পষ্ট উজ্জ্বল। সে অস্পষ্টতায় দেখা বেশ যায়, কিন্তু চেনা ভাল যায় না। কমল সন্তর্পণে পথ চলিয়াছিল। শীর্ণ পথ লতার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া কত দিকে শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে।

অল্প অল্প বাতাসও বহিতেছিল। শীত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কমল কাপড়খানাকেই বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইল। হাসিও আসিল তাহার। কানু শুনিলে তাহাকে নিশ্চয় রাই-উন্মাদিনী বলিয়া ঠাট্টা করিবে। আর পাগল হইতে বাকিই বা রহিয়াছে কোথায়? কিন্তু পাগল হইয়াও তো আকাশে ফুল ফোটানো গেল না! কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সংকল্প করিল, এই শেষ। ইহার পর আর সে আকাশে ফুল ফুটাইবার কল্পনা করিবে না। কমল একবার দাঁড়াইল। চারিদিক বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া মনে মনে কথা কহিতে কহিতে আবার চলিল। চারিদিকের গ্রামের বনশোভা ঘষা কালো ছবির মত দেখা যাইতেছিল। মাথার উপরে কাটা কাটা মেঘের মধ্য দিয়া আলো-আঁধারির খেলা খেলিতে খেলিতে চাঁদও চলিয়াছিল এই একাকিনী যাত্রিণীর সঙ্গে।

কিন্তু পথ যে ফুরায় না! পথ ভুল হইল না তো?—চারিদিকেই তো পথ!

কমল থমকিয়া দাঁড়াইল। আকাশে চাহিয়া দেখিল, চাঁদ প্রায় মাথার উপরে আসিয়াছে। রাত্রি তবে তো অনেক হইয়াছে। চারিপাশে চাহিয়া দেখিল, গ্রাম সেই দূরে, ছবির মত মনে হইতেছে—যত দূরে ছিল তত দূরেই আছে, এতটুকু নিকটবর্ত্তী হয় নাই। মধ্য-প্রান্তরের মধ্যে সে শুধু একা দাঁড়াইয়া। কমলের কান্না পাইল।

এই সীমাহারা প্রান্তরে একা সে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে! কেন এমন ভুল সে করিল, কেন সে সন্ধ্যার মুখে একা এই বিস্তীর্ণ মাঠে নামিল? কে তাহাকে পথ দেখাইবে?

দেহ মন যেন তাহার ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া কমল কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কতক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া ছিল কে জানে! হঠাৎ তাহার কানে কোন পথচারীর কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌঁছিল। পথিক যেন গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিয়াছে। কমল উঠিয়া পড়িল। স্বর লক্ষ্য করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া চলিল। অদূরে ছায়ার মত মানুষের কায়া যেন দেখা যাইতেছে।

সে আর্ত্তস্বরে ডাকিল, কে গো?

আবার ডাকিল, ওগো, কে গো তুমি? একটু দাঁড়াও।

পথিক দাঁড়াইল।

কমল ডাকিয়া বলিল, একটু দাঁড়াও গো। পথ হারিয়েছি আমি।

পথিক এবার শব্দ লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? সে সেই দিকেই হাঁটিতে শুরু করিল। আলপথের একটি বাঁকের উপরে দুইজনের মুখামুখি দেখা হইল। কমল দেখিল, পথিক যুবা। শুধু যুবা নয়, রূপও আছে তাহার।

মেঘের একটা স্তর ছাড়াইয়া আকাশের চাঁদ তখন পরিপূর্ণ-ভাবে উঠিয়াছে। অকস্মাৎ পুরুষটি বিস্ময়-ভরা কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল, কমল? চিনি?

কমলও বুঝি চিনিয়াছিল, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঞ্জন—তাহার লক্ষা।

কমলের মনে একটি গোপন আশঙ্কা জাগিয়াছিল। একবার মনে হইল, এ সেই। তাহার শ্যামচাঁদ, রঞ্জনের রূপ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন অনেক গল্প সে শুনিয়াছে। যেখানে যে শ্যাম-বিগ্রহের দরবারে সে চলিয়াছে, সেই শ্যামই তো জয়দেব গোস্বামীর রূপ ধরিয়া পদ্মাবতীকে ছলনা করিয়া কবির অসমাপ্ত গান সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। স্থির দৃষ্টিতে সে রঞ্জনের দিকে চাহিয়া রহিল।

রঞ্জন আবার ডাকিল, কমল! রাই-কমল!

সে তাহার হাত ধরিয়া ডাকিল এবার। রাই-কমলের চেতনা ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ পর আপনাকে সংযত করিয়া বুঝিল,

সত্য সত্যই এ রঞ্জন। অস্পষ্ট ছায়ালোকের মধ্যে ক্ষেতের বুকে তাহার দেহের দীর্ঘ ছায়াখানি বাঁকাভাবে পড়িয়া আছে। দেবতার ছায়া পড়ে না। রঞ্জন—এ সেই রঞ্জন। দেবতা নয়, মানুষ।

আশ্চর্য্য! তবুও তাহার বুক বিপুল আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

রঞ্জনই আবার কথা বলিল, তুমি এখানে এত রাত্রে কেমন ক'রে এলে কমল?

কমল তখনও তাহাকে দেখিতেছিল। রঞ্জনের বৈষ্ণবের বেশ। তাহার মনে পড়িল, রঞ্জন পরীকে লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। রঞ্জনের প্রশ্নে সে সজাগ হইয়া উঠিল। বলিল, জয়দেব যাব। কিন্তু তুমি—কি বলব তোমাকে, কি নাম নিয়েছ? তুমি কোথা যাবে?

রঞ্জন বৈষ্ণবের মতই মৃদু হাসিয়া বলিল, নাম এখন আমার রাইদাস মহান্ত।

কমল অকারণে লজ্জা পাইল। রঞ্জন বলিল, আমিও জয়দেব যাব। আমার সঙ্গেই এস, কি বল?

কমল কহিল, চল।

কমলের মনের মধ্যে কত প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া মরিতেছিল, কিন্তু কথা যেন জিভে জড়াইয়া যাইতেছে। পথ চলিতে চলিতে রঞ্জন আবার বলিল, রসিকদাস চ'লে গেল?

কমল উত্তর দিল না। রঞ্জন বলিল, আমি তোমাদের খবর সবই জানি। বাউলের যে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞান হয়েছে, এও ভাল।

তারপর দুইজনেই নীরব। শুক্লা-দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিম আকাশে অস্ত যাইতেছিল। মেঘের ছায়া ঘন হইয়া কায়া গ্রহণ করিতেছিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে চারিদিক। কমল মৃদু স্বরে প্রশ্ন করিল, পরী ভাল আছে?

রঞ্জন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শেষ-জীবনে বড় কষ্টই সে দিলে আমায়; নিজেও পেলে—রোগের যন্ত্রণায় দিন-রাত্রি চীৎকার! আর সে কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি—অস্থিকঙ্কালসার! উঃ, মনে করতেও শরীর আমার শিউরে ওঠে।

সমবেদনায় কমলও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, আহা! পরী মরিয়া গিয়াছে!

আক্ষেপ করিয়া রঞ্জন বলিল, গুরু পেয়েছিলাম ভাল। ভাল আখড়া, দেবসেবা, কিছু দেবোত্তর—সবই তিনি আমায় দিয়ে গেছেন। দিনও কিছুদিন মন্দ কাটে নাই। কিন্তু তারপরই এই অশান্তি। এক দিকে দেবতার সেবা, এক দিকে মানুষের সেবা।··· এ কি চিনি, শীতে যে কাঁপছ তুমি? গায়ে কাপড় দাও।

কমল বলিল, থাক্।

না না, এ ঠাণ্ডায় কঠিন ব্যারাম হতে পারে। গায়ে কাপড় দাও।

এবার বাধ্য হইয়া কমলকে জানাইতে হইল, সে গায়ের কাপড় আনিতে ভুলিয়াছে।

রঞ্জন বলিল, তাই তো! তা হ'লে এক কাজ কর, আমার গায়ের কাপড়খানা—

কমল প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না।

পথ চলিতে চলিতে রঞ্জন বলিল, ভাল মনে পড়েছে। দাঁড়াও, আমার কাছে যে আরও দুখানা নতুন গরম কাপড় রয়েছে।

সে আপনার পোঁটলা খুলিয়া দুইখানি গায়ের কাপড় বাহির করিল—একখানি গাঢ় নীল, অপরখানি হলুদ রঙের। নীল রঙের কাপড়খানি সে কমলের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, না নিলে আমার বড় দুঃখ হবে চিনি।

কমল আর 'না' বলিতে পারিল না। নীল গায়ের কাপড়-খানি তাহাকে মানাইলও বড় ভাল। রঞ্জন ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, আমার দেওয়া মিছে হয় নাই রাই-কমল। প্রতিবার আমি জয়দেবে আসি, আর রাধাগোবিন্দকে শীতবস্ত্র ভেট দিই। তাঁর গায়ের কাপড়ের রঙ হলুদ, আর রাধার গৌর অঙ্গে নীল রঙই মানায় ভাল।

কমল দারুণ লজ্জায় মৃদুস্বরে বলিল, ছি, তুমি করলে কি?

রঞ্জন বলিল, ঠিক করেছি। রাধারাণীই নিয়েছেন রাই-কমল।

পরদিন প্রভাতে কমল অজয়ে স্নান করিয়া মন্দিরে গেল। মনে হইল, বিগ্রহ যেন হাসিতেছে। চারিদিকে বাউল বৈষ্ণবে গান ধরিয়াছে। সেও মন্দিরা বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে।

তাহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে, সঙ্গীতের শিল্পচাতুর্য্যে মুগ্ধ শ্রোতার দল ভিড় জমাইয়া ফেলিয়াছিল। গান শেষ হইলে পূজারী আসিয়া একগাছি প্রসাদী মালা দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, ভক্তি তোমার অচলা হোক।

প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সে জল খাইবার জন্য যাইতেছিল অজয়ের ঘাটে। মন্দিরসীমার বহির্দ্বারে রঞ্জন দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, কি প্রসাদ পেলে, আমায় ভাগ দাও কমল।

কমল পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, প্রসাদ পেয়েছি—শ্যামচাঁদের আশীর্ব্বাদী মালা।

রঞ্জন বলিয়া উঠিল, তাই দাও আমায়।

কমল এ কথার উত্তর দিল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল। রঞ্জন বলিল, রাধারাণীর কি দয়া আমার ওপর হবে না কমল?

কমল বলিল, তাই নাও। তারপর স্বর নামাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া বলিল, অনেক ভেবে দেখলাম—বাউল বল, দেবতা বল, সবার ভেতর দিয়ে তোমাকেই চেয়ে এসেছি এতদিন।

এগারো

জয়দেবধামের মন্দিরপ্রাঙ্গণে রঞ্জনকে বরণ করিয়া সেইখান হইতেই কমল তাহার অনুগামিনী হইল। ঘরের কথা মনে হইল না। কান্থর কথা মনে হইলেও কান্থ যেন অনেক ছোট

হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, ইহার পর ননদিনীকে একটা সংবাদ পাঠাইয়া দিলেই হইবে, কিংবা তাহারা দুইজনে গিয়া একেবারে তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিবে। পোড়ারমুখী ননদিনী ছুটিয়া আসিয়া অবাক হইয়া যাইবে।

কল্পনার জাল বুনিতে বুনিতে রঞ্জনের সঙ্গে তাহার আখড়ায় যখন গিয়া পৌঁছিল, বেলা তখন যায় যায়, গোধূলির আলো ঝিকিমিকি করিতেছে।

মনের মধ্যে উল্লাসের তৃপ্তির আর পরিসীমা ছিল না তাহার। কিন্তু সে উল্লাস বাহিরে প্রকাশ করিবার যেন উপায় ছিল না। রঞ্জনকে সম্ভাষণ করিবার যোগ্য সম্বোধন সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার লঙ্কা—কিন্তু ছিঃ! মহান্ত বলিতেও যে লজ্জা হয়, মনও উঠে না। মনে মনে বিচার করিয়া 'লঙ্কা'র চেয়ে 'মহান্ত' সম্বোধন কিছুতেই সে প্রিয়তর বা মধুরতর মনে করিতে পারিল না।

রঞ্জন উল্লসিত হইয়াছিল। কপোতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া কপোত যেমন অনর্গল গুঞ্জন করিয়া ফেরে, তেমনই ভাবে সে কখনও কমলের আগে, কখনও পিছনে পথ চলিতে চলিতে অনর্গল কথা কহিয়া চলিয়াছিল।

গ্রামে ঢুকিবার মুখে রঞ্জন বলিল, আজ সন্ধ্যেতে কিন্তু আমার ঠাকুরকে গান শোনাতে হবে কমল।

কমল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। মনে মনে স্থিরও করিয়া রাখিল, কোন্ গান সে গাহিবে। গানের কলিগুলি মনের মধ্যে তাহার এখনই গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়ামুখচন্দা।

আখড়ার নিকট আসিয়া আগড় খুলিয়া রঞ্জন বলিল, এস, এই আমার আখড়া।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কমল চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। আখড়াটি সুন্দর। শুধু সুন্দর নয়, ভিক্ষুকের ভবনের মধ্যেও স্বচ্ছল সমৃদ্ধির পরিচয় চারিদিকেই সুপরিস্ফুট। এক দিকে জাফরিবোনা বাঁশের বেড়ার মধ্যে গাঁদাফুলের গাছ। গাছগুলির সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ভারে ভারে ফুল ফুটিয়া আছে। মাঝে মাঝে কয়টা রাধাপদ্মের গাছে বড় বড় হলদে ফুলের সমারোহ। কয়টা সন্ধ্যামণিগাছে তখন সদ্য সদ্য রাঙাবরণ ফুল ফুটিতেছিল। ওপাশে পাঁচ-ছয়টা আমগাছ মুকুলে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মাঝ-আঙিনায় একটা সজিনাগাছের পুষ্পিত শীর্ষগুলি মাটির দিকে নুইয়া পড়িয়া বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে।

সম্মুখেই দাওয়া—উঁচু বাঁধানো-মেঝে মেটে ঘর একখানি। তাহার ঠিক পাশেই ঘরখানির সহিত সমকোণ করিয়া আর এক-খানি ছোট্ট ঘর। তাহারও বাঁধানো মেঝে। আকারে প্রকারে মনে হয়, এইটিই বিগ্রহ-মন্দির। দুয়ারের চৌকাঠে, সিঁড়িতে আলপনার দাগ অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল।

কমলের অনুমানে ভুল হয় নাই। রঞ্জন গিয়া ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিয়া কহিল, এস, প্রণাম করি।

কমল দেখিল, মন্দিরের মধ্যে গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ। রঞ্জন ও কমল পাশাপাশি বসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

মহান্ত

পিছনে অস্বাভাবিক দুর্ব্বল কণ্ঠস্বরে কে যেন বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কমল চমকিয়া উঠিল। প্রণাম তাহার সম্পূর্ণ হইল না, সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, ও-ঘরের দাওয়ার উপরে অদ্ভুত এক নারীমূর্ত্তি প্রাণপণে দুই হাতে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতেছে। কমল শিহরিয়া উঠিল। মানুষের দেহের এমন ভয়ঙ্কর কুৎসিত পরিণতি সে আর দেখে নাই। কঙ্কালাবশেষ জীর্ণ দেহ হইতে বুকের কাপড় শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কমল দেখিল, সে বুকে অবশিষ্টের মধ্যে শিথিল চর্ম্মের আবরণের মধ্যে শুধু কঙ্কালের স্তূপ। সেই স্তূপ ভাঙিয়া বাহিরে আসিবার জন্য প্রাণ হৃৎপিণ্ডের দ্বারে যেন উন্মত্তভাবে মাথা কুটিতেছে।

রঞ্জন কর্কশ কণ্ঠে কহিল, এ কি! আবার তুই বাইরে এসেছিস পরী? পরী!

অজ্ঞাতসারে কমল অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, পরী!

এই পরী! সেই পরীর এই দশা! সেই হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ মেয়ে এমন হইয়া গিয়াছে! সেই পরিপুষ্ট সুডৌল মুখ এমন শীর্ণ দীর্ঘ দেখাইতেছে! মুখে ও চামড়ার নীচে প্রত্যেকটি হাড় দেখা যায়। গালের কোনও অস্তিত্বই নাই যেন, আছে শুধু দুইটা গহ্বর। পরীর চুলের শোভা ছিল কত! কিন্তু এখন

সেখানে সাদা মসৃণ চামড়া বীভৎসভাবে চকচক করিতেছে। যে কয়গাছা চুল আছে, তাহার বর্ণ পিঙ্গল, রুগ্ন কর্কশতায় বীভৎস। চর্ম্মসার কঙ্কালের মধ্যে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল শুধু দুইটি চোখ, চোখ দুইটা যেন দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। শীর্ণ দেহের মধ্যে কোথাও স্থান না পাইয়া মানব-হৃদয় যেন ওইখানে বাসা গাড়িয়াছে। ক্রোধ, হিংসা, অভিমান, লোভ, মমতা, স্নেহ, সব আত্মপ্রকাশ করে ওই দৃষ্টির মধ্য দিয়া।

রঞ্জনের কর্কশ তিরস্কারে পরী কর্ণপাত করিল না। সে আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কে মহান্ত?

দৃষ্টি দিয়া পরী যেন কমলের রূপসম্ভারভরা সর্ব্ব অবয়ব গ্রাস করিতেছিল।

রঞ্জন বলিল, চিনতে পারলে না? ও যে কমল। তুমি যে আমায় বলেছিলে পরী—

পরী পাগলের মত দুই হাতে আপনার বুক চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, বলি নাই; বলি নাই আমি। সে আমি মিথ্যে বলেছি। তোমার মন রাখতে, মন বুঝতে বলেছি আমি।

হা-হা করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

কমল থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। রঞ্জন তাহার হাত ধরিয়া ডাকিল, কমল, কমল!

দেবতার ঘরের খুঁটিটা ধরিয়া কমল বলিল, পরী বেঁচে থাকতে তুমি এ কি করলে? আমায় তো তুমি বল নাই! ছি!

রঞ্জন বলিল, পরী মরেছে, সে কথা তো আমি বলি নাই কমল।

সে কথা সত্য কি না যাচাই করিয়া দেখিবার সময় সে নয়। কমল বলিল, ধর ধর, তুমি পরীকে গিয়ে ধর। প'ড়ে যাবে, প'ড়ে যাবে হয়তো।

রঞ্জন পরীকে ধরিয়া ডাকিল, পরী, পরী!

তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পরী বলিল, কি করলে গো, এ তুমি কি করলে? তুটো দিন সবুর করতে পারলে না? আমি তো বাঁচব না। তু দিনও হয়তো বাঁচব না। তু দিনের জন্যে আমার বুকে এ তুমি কি শেল হানলে গো?

আবার সে হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রক্তমাংসের মানুষ লইয়া এ কি কুশ্রী কাড়াকাড়ি! কমলের করুণা হইল। ওই মেয়েটির বুকে যে আজ কি বেদনা, কত তাহার পরিমাণ, সে তো নিজে নারী, সে তাহা বোঝে। শুধু তাই নয়, আজ যে তাহাকে কঠোরভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল, তোমায় মরিতে হইবে। একান্ত নিঃস্ব রিক্ত হইয়া কাঙ্গালিনীর মরণ মরিতে হইবে।

কমলের চক্ষে জল দেখা দিল। সে আসিয়া পরীর পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, পরী, আমার ওপর রাগ করলি ভাই?

বেরো—বেরো—দূর হ—দূর হ। চীৎকার করিয়া পরী তাহার কঙ্কালসার দেহে যতখানি শক্তি ছিল প্রয়োগ করিয়া কমলকে লাথি মারিয়া বসিল। অতর্কিত কমল নীচে উল্টাইয়া

পড়িয়া গেল। রঞ্জন কিছু করিবার পূর্ব্বেই কমল নিজেই উঠিয়া বসিল।

ও কি, তোমার ভুরু থেকে রক্ত পড়ছে যে! রঞ্জন পরীকে ছাড়িয়া দিয়া কমলের পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

পরীর চোখ বাঘিনীর চোখের মত হিংস্র দীপ্তিতে দপদপ করিয়া জ্বলিতেছিল।

সে দৃষ্টি কমল দেখিয়াছিল। ভ্রূতে বুলানো রক্তমাখা হাতখানি দেখিতে দেখিতে সে বলিল, না না, লাগে নাই আমার। যাও, তুমি পরীকে ধর—ও রোগা মানুষ। আমি নিজেই ধুয়ে ফেলছি।

কমল এপাশ ওপাশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, একটি চারা আমগাছের তলায় জল ফেলিবার জন্য একটুখানি স্থান বাঁধানো রহিয়াছে। বালতির জল লইয়া সে ভ্রূর রক্ত ধুইতে বসিল। ধুইতে ধুইতে শুনিল, পরী বলিতেছে, না না, এমন ক'রে তুমি চেও না। রাগ ক'রো না। দুটো দিন, দুটো দিন ওকে পর ক'রে রাখ। আদর ক'রো না, কথা ক'য়ো না। দুটো দিন গো, দু দিন বই আর আমি বাঁচব না। সত্যি বলছি।

সন্ধ্যায় দেবতার সম্মুখে নিত্য কীর্ত্তন হয়। রঞ্জন কমলকে বলিল, এস, আমার প্রভুকে গান শোনাবে এস।

কমল বলিল, না।

রঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বলিল, সে কি? এ এখানকার

নিয়ম। আর এরই মধ্যে লোকজন এসেছে সব, তাদের বলেছি আমি।

কমল দৃঢ়স্বরে বলিল, না। পরীর অবস্থাটা ভাব দেখি। আমার গান শুনলে সে হয়তো পাগল হয়ে উঠবে।

রঞ্জন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হুঁ।

কমল আবার বলিল, যাও, তুমি নাম-গান আরম্ভ করগে, সন্ধ্যে ব'য়ে যাচ্ছে। আমি বরং যাই, দেখে শুনে পরীর জন্যে একটু সাবু কি বার্লি চড়িয়ে দিই।

রঞ্জন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে কমলের হাত ধরিয়া বলিল, কমল, আগে দেবসেবা, পরে মানুষ। এস বলছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কমল বলিল, আমারও এতদিন তাই ছিল। কিন্তু আজ আমি ধর্ম্ম পালটেছি। ছাড় আমাকে তুমি।

রঞ্জন হাত ছাড়িয়া দিল। কমল ধীর পদক্ষেপে ওদিকে চলিয়া যাইতেছিল, রঞ্জন অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, মরবেও না, আমারও অশান্তি ঘুচবে না।

কমল ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ভৎ´সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, দেবতার পায়ে প্রাণ ঢেলেও দেবতার সাড়া পাই নি। দেবতা পাথরের ব'লে মানুষকে ধরেছি জড়িয়ে। মানুষের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিও না আর। ছি!

রঞ্জন এতটুকু হইয়া গেল। ঘরের ভিতরে দুর্ব্বল ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে পরী গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল।

রঞ্জন নিজেই খোল লইয়া দেবতার দুয়ারে বসিল।

কীর্ত্তন ভাঙিয়া গেলে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, কমল !

কমল তখন পরীর কাছে বসিয়া ছিল। পরীর সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। কিন্তু তখনও তাহার তন্দ্রাতুর বক্ষের ক্রন্দনকম্পিত দীর্ঘশ্বাস মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া আসিতেছিল।

কমল সন্তর্পণে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন বলিল, নাও।

সে একডালা ফুল আগাইয়া দিল। কমল হাত বাড়াইয়া লইল। কিন্তু জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রঞ্জন হাসিয়া বলিল, ফুলশয্যা—

না।

রঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন ?

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ভুল ক'রে ক'রেই জীবন চলেছে আমার। যত বড় মানুষ আমি, ভুলের পর ভুল জমা করলে সেও বোধ হয় তত বড়ই হবে। আবারও বোধ হয় ভুল করলাম আমি।

রঞ্জন কমলের কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কমল বলিল, যে মানুষের প্রয়োজন নাই, তার কি কোন দাম নাই তোমার কাছে? একবার পরীর কথা ভাব দেখি।

রঞ্জন বলিয়া উঠিল, কমল, তুমি কি পাথর ?

আমি ? কমল হাসিল। তারপর আবার বলিল, পাথর হ'লে পাথরেই মন উঠত লঙ্কা। এ কথা আর একবার বলেছি।

মানুষ ব'লেই মনুষের জন্যে পাগল হয়েছি, মানুষের জন্যে মমতা না ক'রে যে পারি না।

আচ্ছা, থাক্। রঞ্জন ঈষৎ উষ্মাভরেই সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল।

মহান্ত !—ঘরের ভিতর হইতে পরী ডাকিতেছিল।

কমল তাড়াতাড়ি পরীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজনায় পরী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, না না, স'রে যা—স'রে যা তুই বলছি।

সভয়ে কমল বাহিরে আসিয়া রঞ্জনকে বলিল, যাও, ডাকছে তোমায়। একান্ত অনিচ্ছার সহিত রঞ্জন পরীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। পরী বলিল, আজ তোমার ফুলের বাসর হবে, নয়? তোলা বিছানার মধ্যে তোশক বালিশ—

বাধা দিয়া রঞ্জন বলিল, থাক্ থাক্, ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না পরী।

না। বিছানা নামিয়ে নাওগে। কিন্তু আমি শখ ক'রে যা যা করিয়েছি, সেগুলো নিও না। সে আমার, সে আমি সইতে পারব না। প্রাণ থাকতে সে দেখতে আমি পারব না।

উত্তরে রঞ্জন অতি কটু একটা জবাব দিতে গেল। কিন্তু পিছনে লঘু পদশব্দে কমলের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া সে তাহা পারিল না। শুধু পরীর মাথায় হাত বুলাইতে চেষ্টা করিল। পরী হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, থাক্।

রঞ্জনও যেন বাঁচিল, সে চলিয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে রঞ্জন তামাক খাইতেছিল। কমল আসিয়া কহিল, তোমার বিছানা পরীর ঘরে।

রঞ্জন চমকিয়া উঠিল। কমল বলিল, 'না' বলতে পাবে না। আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।

রঞ্জন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—বার বার অস্বীকার করিয়া বলিল, না না। রোগীর গায়ের গন্ধে আমার ঘুম হবে না। শান্তভাবে কমল প্রত্যুত্তরে বলিল, তা হ'লে আমারও যদি কোন দিন ওই পরীর মত দশা হয়, তবে তো তুমি এমনই ক'রেই আমাকে জঞ্জালের মত ঘেন্না করবে, আঁস্তা-কুড়ে ফেলে দিতে চাইবে!

রঞ্জন চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে হাসিমুখেই কমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার জয় হোক কমল।

কমল হেঁট হইয়া রঞ্জনের পায়ের ধুলা লইল। রঞ্জন মুহূর্ত্তে অবনত কমলকে বুকে টানিয়া তুলিয়া লইল, চুম্বনে চুম্বনে অধর ভরিয়া দিল, সবল পেষণে যেন পিষ্ট করিয়া দিতে চাহিল। কমলের চোখ দুইটিও আবেশে মুদিয়া আসিতেছিল। এ আনন্দ তাহার অনাস্বাদিতপূর্ব্ব। রসিকদাসও তাহাকে এমনই আদরে বুকে লইয়াছে, কিন্তু সে যেন তাহাতে পাথর হইয়া যাইত। ঠিক এই সময়ে ভিতরে পরীর সাড়া পাওয়া গেল, সে বোধ হয় আবার কাঁদিতেছে। মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া সে বলিল, ছাড়।

না।

কমল বলিল, ছাড়। যে মরতে বসেছে, তাকে আর ঠকিও না।

রঞ্জনের বাহুবেষ্টনী শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, কমল আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, যাও, শোওগে যাও।—বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, এপাশের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে পরীর ঘরখানি পরিষ্কার করিবার জন্য সে সেই ঘরে ঢুকিল। ঝাঁট দিতে দিতে পরীর দিকে চাহিতেই সে দেখিল, পরী তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। কমলের ভয় হইল, পরী হয়তো আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিবে।

কমলি !—পরী তাহাকে ডাকিল।

পরী আবার ডাকিল, শোন্, আমার কাছে আয় ভাই কমলি। ভয় নাই।

কমল কাছে আসিয়া বসিল। পরীর জীর্ণ দেহে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল, ভয় কি ভাই ?

পরী সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, রূপ একদিন আমারও ছিল।

কমল চমকাইয়া উঠিল। করুণ হাসি হাসিয়া পরী বলিল, তোকে আশীর্ব্বাদ করব ব'লেই ডাকলাম ভাই। আজ ছ মাস বিছানা পেতেছি, ছ মাস একা প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছি। বড় সাধ ছিল ভাই, সে সাধ তুই মেটালি। আশীর্ব্বাদ করি—

আর সে বলিতে পারিল না, অকস্মাৎ অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিল। কমল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, পরী, পরী!

বালিশে মুখ গুঁজিয়া পরী শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, না না। তুই যা, তুই যা। আমার সামনে থেকে তুই যা।

ওই দিন সন্ধ্যাতেই পরী দেহ রখিল। যেন ওই আকাঙ্ক্ষাটুকুই তাহার জীবনকে জীর্ণ পঞ্জরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। বহুদিনের রোগী প্রায় সজ্ঞানেই দেহত্যাগ করে। পরীরও তাহাই হইয়াছিল। বৈকালের দিকে শ্বাস উপস্থিত হইতেই রঞ্জন বলিল, পরী, চল, তোমাকে প্রভুর সামনে নিয়ে যাই, প্রভুকে একবার দেখ।

পরী হাত নাড়িয়া বলিল, না।

জীবনের জ্বালা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষের বোধ হয় যায় না। কষ্টের পরিসীমা ছিল না, তবুও পরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেবতার সেবা অনেক করেছি, কিন্তু দেবতা আমায় কি দিলে? দেবতা নয়; মহান্ত, তুমিও না। তোমার মুখ আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না। স'রে যাও তুমি। আমি একা থাকব।

তারপর একটি সকরুণ হাসি হাসিয়া বলিল, আমি তো আজ একাই।

আপন জীবনের সমস্ত তিক্ত রসটুকু হতভাগী নিঃশেষে পান করিয়া তবে গেল।

বারো

তারপর ?

তারপর একটি অবিচ্ছিন্ন মিলনের গাঢ় আনন্দ। এই আনন্দের মধ্য দিয়া দিবারাত্রিগুলি স্বচ্ছন্দ শ্বাসপ্রশ্বাসের মত বহিয়া যায়। মিলনের আবেশে চোখের নিমিখ নামিয়া আসে, সে নিমিখ খুলিতে খুলিতে রাত্রি আসে। আবার রাত্রি কাটিয়া প্রভাত হয়। পাখির কলরব জাগিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যাহার ঘুম ভাঙে, সে অপরের কানের কাছে মৃদুস্বরে গায়—

রাই জাগো—রাই জাগো
ওই শুক সারী বোলে।

ঘুম ভাঙে। প্রভাত হইতে আবার আরম্ভ হয়—হাসি, গান, আনন্দ, অভিমান, অনুনয়, অভিনয়, অশ্রু। আবার মিলন হয়। আবার হাসি, আবার আনন্দ। মোট কথা, দুইটি তরুণ নর-নারীর জীবনের যা লীলা—তাই। পুরাতন ধারা জীবনে ঘুরিয়া ফিরিয়া অল্প একটু বেশপরিবর্ত্তন করিয়া দেখা দেয়। নর-নারী দুইটি কিন্তু ছদ্মবেশ ধরিতে পারে না। তাহারা পায় তাহার মধ্যে নূতনের সন্ধান।

কিন্তু তবু কমল মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠে। মনে হয়, পরী যেন ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া কোন্ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে।

সেদিন দোল। বসন্ত-পূর্ণিমা শেষ-ফাল্গুনে আসিয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণা বাতাসের গতি ঈষৎ প্রবল। ঘরে দোলনা খাটানো হইয়াছে। দেবতার পায়ে আবীর-কুমকুম নিবেদন

করিয়া দিয়া থালাখানি হাতে রঞ্জন দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। কমল বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। কৌতুকভরে রঞ্জন একটা কুমকুম ছুঁড়িয়া কমলকে মারিল। রাঙা মুখে কমলও উঠিয়া একটা কুমকুম তুলিয়া লইল।

কিন্তু সে কুমকুম তাহার হাতেই থাকিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া বিবর্ণ মুখে সে বলিয়া উঠিল, কে কাঁদছে গো?

সবিস্ময়ে রঞ্জন প্রশ্ন করিল, কই? কোথা?

ওই ঘরে।

ওই ঘরটায় পরী মরিয়াছিল। সত্যই একটা অস্ফুট কান্নার মত শব্দ যেন দীর্ঘায়িত বিলাপের ছন্দে বাজিতেছিল।

সাহস করিয়া রঞ্জন ঘরে ঢুকিল। বাতাসের তাড়নায় একটা খোলা জানালা ধীরে ধীরে দুলিতেছিল—তাহারই মরিচা-ধরা কব্জার শব্দ সেটা।

রঞ্জন হাসিয়া উঠিল।—এত ভয় তোমার?

কমল হাসিতে চেষ্টা করিল।

এমনই করিয়া দিন কাটে। দিনে দিনে মাস—মাসে মাসে বৎসর চলিয়া যায়। বৎসরের পর বৎসর যাইতেছিল। পাঁচ বৎসর পর বোধ হয়। কমল হঠাৎ একদা অনুভব করিল, দিনগুলি যেন বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। দিনগুলির ধারাও কেমন যেন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমন স্বচ্ছন্দ গতিতে আর যায় না—কেমন যেন মন্দগতি। মধ্যে মধ্যে কাটিতে চায় না দিন।

রঞ্জন আখড়ার জমি-জমা লইয়া বড় বেশি জড়াইয়া পড়িয়াছে। কাজের আর অন্ত নাই।

দোলের দিন রঙ-খেলায় সে আর তেমন করিয়া মাতে না। ঝুলনের দিন বকুলশাখায় ঝুলনা আর ঝুলানো হয় না। রঞ্জন গাছে উঠিতে পারে না, বলে, এ বয়সে হাত পা ভাঙলে, বুড়ো হাড় জোড়া লাগবে না। রাসের দিন দেবতার রাস সারিয়া রঞ্জন ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুম আসে না কমলের। মধ্যে মধ্যে সেই পুরানো ভয় হঠাৎ তাহাকে চাপিয়া ধরে। মনে হয়, ও ঘরের মধ্যে পরী যেন পদচারণা করিয়া ফিরিতেছে।

কমল ক্রমে হাঁপাইয়া উঠিল।

সেদিন রঞ্জন খাইতে বসিলে সে বলিল, দেখ, চল, কিছুদিন তীর্থ ঘুরে আসি।

রঞ্জন বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। কমল বলিল, আমার ভাল লাগছে না বাপু, চল, একবার ব্রজধাম ঘুরে আসি।

শ্লেষের হাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল, কত খরচ জান? বোষ্টম-ভিখারীর ঝুলিতে তা নাই।

কমল ম্লান হইয়া গেল, বলিল, তোমার তো টাকা না-থাকার নয়।

রঞ্জন পরিষ্কার বলিল, আমার একটি পয়সাও নাই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কমল আবার বলিল, বেশ তো, কাজ কি টাকাকড়িতে? চল, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে ক'রে বেরিয়ে পড়ি।

রূঢ় কণ্ঠে রঞ্জন বলিল, আমার বাবা এলেও তা পারবে না।

কমল আঘাত পাইল, অভিমানও হইল। কিন্তু কেন কে জানে, সে অভিমান প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না।

ইহার পর কমল যেন সজাগ হইয়া উঠিল। মহান্তের সেবা-যত্নের পারিপাট্যে গভীরভাবে সে আত্মনিয়োগ করিল। রঞ্জনও একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু কমলের মনে অতৃপ্তি ঘুরিয়া মরে। তাহার মনে হয়, সে দিন আর নাই। সে ব্যাকুল অন্তরে সেই হারানো দিন ফিরিয়া পাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল।

দোলের দিন আবার সে রঙের খেলা খেলিতে চায়, রাসের রাত্রে সারা রাত্রি জাগিয়া সে গান করিতে চায়, জীবনে সে লীলা চায়।

শ্রাবণ মাস, সম্মুখেই ঝুলন-পূর্ণিমা। শুক্লপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণমুখর একটি রাত্রি। রঞ্জন বাড়িতে ছিল না, কমল দাওয়ার উপর বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। ওপাশে শুইয়া ছিল বাউড়ী-বুড়ী। মহান্ত না থাকিলে ওই বুড়ী বাড়িতে শোয়।

মেঘাবরিত চাঁদের জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ প্রভার মধ্যে অবিরাম ধারা-পাতের ঝরঝর ধারা কুহেলীর মত দেখা যাইতেছিল। রাত্রিটি কমলের বড় মধুর লাগিল। আকাশ নীচে নামিয়া শ্যামা ধরণীকে আলিঙ্গন করিতে চায়, কিন্তু বাতাস নিয়তির মত পথ রোধ করিয়া হা-হা করিয়া হাসে, তাই আকাশ যেন কাঁদিয়া সারা।

কমল মনে মনে আগামী দিনের জন্য এমনই একটি রাত্রি বার বার কামনা করিল। একটি সুন্দর সঙ্কল্প করিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেব-মন্দিরে ঝুলনা ঝুলানো হইয়াছে, যুগল বিগ্রহ ঝুলনে চাপিয়াছেন। কমল সঙ্কল্প করিল, সেকালের মত শয়ন-মন্দিরে তাহারাও ঝুলনা বাঁধিয়া ঝুলনে দোল খাইবে।

কমল কল্পনা করিতে করিতে বিভোর হইয়া উঠিল।

সবুজরঙের ছোপানো সেই কাপড়খানি সে পরিবে। চুল এলানো থাকাই ভাল। নাকে রসকলি, কপালে চন্দন। মহান্তের গলায় দিবে গন্ধরাজের মালা। নিজের জন্য বেলফুলের মালাই তাহার পছন্দ হইল।

কিন্তু এমন জ্যোৎস্নাস্বচ্ছ বর্ষণমুখর রাত্রিটি কি কাল হইবে? কমলের আপেক্ষ হইতেছিল। আজ যদি সে থাকিত! শুধু আক্ষেপ নয়, সে তাহার লজ্জার জন্য একটি সলজ্জ বেদনাময় অভাব অনুভব করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই, যেন নিজের কাছে নিজের লজ্জা বোধ হইতেছিল তাহার।

কখন বাউড়ী-বুড়ীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিল, ঘর-দোরে আলো কই গো? সন্ধ্যে-পিদিম জ্বাল নাই নাকি?

কমল চমকিয়া উঠিল। তাই তো, মহাপ্রভুর ঘরে—যুগল বিগ্রহের ঘরেও যে আলো দেওয়া হয় নাই, কীর্ত্তন গাওয়া হয় নাই! তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া সে প্রদীপ জ্বালিতে বসিল।

প্রদীপ দেওয়া শেষ করিয়া সে নিয়মমত খঞ্জনী লইয়া কীর্ত্তন গাহিতে বসিল। গান ধরিল—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—

অকস্মাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে করিয়াছে কি? যুগল বিগ্রহ যখন পূর্ণ মিলনানন্দে ঝুলনে চাপিয়াছেন, তখন সে এ কি গান গাহিল? মনে মনে বার বার মার্জ্জনা চাহিয়া সে ঝুলনের গান ধরিল।

পরদিন প্রভাতেও মেঘ কাটিল না। কমল সজল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। কল্পনা করিল, আজিকার রাত্রিটি গত রাত্রির চেয়েও সুন্দর হইবে। আজ চাঁদ এক কলা বাড়িবে যে! সে ঝুলনের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাথালি মাথায় দিয়া সে বড় পিঁড়েখানি ঘরে আনিয়া তুলিল। ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে আলপনা আঁকিতে বসিল। আলপনায় পাশাপাশি দুইটি পদ্ম সে আঁকিল। তারপর সে দোকানে বাহির হইয়া গেল। যখন ফিরিল, তখন মহান্ত আসিয়াছে। মহান্তকে দেখিয়া কমল কাপড়ের আঁচলে কি যেন লুকাইল। বেশ দেখাইয়াই লুকাইল। কিন্তু রঞ্জন সেদিকে লক্ষ্যই করিল না, সে আপন মনেই বলিতেছিল, জ্বালাতন রে বাপু, সারা দিন-রাত টিপটিপ ঝিপঝিপ! হবে তো তাই ভাল ক'রে হয়ে ছেড়ে দে রে বাপু।

কমল বলিল, হোক না বাপু, তোমারই বা কি, আমারই বা কি? কাল কেমন রাতটি হয়েছিল বল দেখি?

রঞ্জন বলিল, হুঁ, তা হয়েছিল। কিন্তু জলে কাদায় যে

পায়ে হাজা ধ'রে গেল। তোমার কি বল, তোমার তো জলই ভাল, তুমি যে কমল।

কমল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এতটুকু আদরেই সে গলিয়া গেল। আঁচলের ভিতর হইতে সে এবার লুকানো জিনিসটি বাহির করিল। বেশ মোটা এক আঁটি দড়ি বাহির করিয়া রঞ্জনের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, দেখ তো।

রঞ্জন এক নজর দৃষ্টি বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি, হবে কি?

কমল তরুণীর মত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, বাঃ রে, আমি বললাম, দেখ তো জিনিসটা কেমন; আর উনি জিজ্ঞেস করছেন, হবে কি? আগে আমার কথার উত্তর দাও।

একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া রঞ্জন বলিল, দড়ি শক্ত বটে। এখন হবে কি শুনি?

সকৌতুকে কমল বলিল, বল দেখি, কি হবে? দেখি তুমি কেমন!

রঞ্জন যেন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, আরে, তাই তো পাঁচ বার জিজ্ঞাসা করছি।

কমল বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, বলছি। কিন্তু আগে আর একটি কথার জবাব দাও দেখি, দুজন মানুষের ভার সইবে এতে?

কেন, গলায় দিয়ে ঝুলতে হবে নাকি? তা সইবে।

কমলের মুখ এক মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। এ কথাটাকে সে কিছুতেই রহস্য বলিয়া মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইতে পারিল না। তবুও সে চেষ্টা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আজ ঝুলন হবে আমাদের। শোবার ঘরে ঝুলনা টাঙাব।

কমলের মুখের দিকে অল্পক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বলি বয়স বাড়ছে, না কমছে ?

রুদ্ধশ্বাসে কমল বলিল, কেন ?

রঞ্জনের হাসির ধারায় কমল ভয় পাইয়া গিয়াছিল। রঞ্জন এবার অতি রূঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল, নইলে এখনও তোমার ঝুলনের সাধ হয় ! আয়নাতে কি মুখ দেখা যায় না, না নিজের রূপ খুব ভালই লাগে ?

কমলের বুকে যেন ব্যথা ধরিয়া উঠিল। দড়ির গোছাটা হাত হইতে আপনি খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে দ্রুতপদে সেখান হইতে পলাইয়া আসিল। তাহার বুকের মধ্যে তখন কান্নার সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। সে গিয়া ঢুকিল পরী যে ঘরটায় মরিয়াছিল সেই ঘরে। মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কমল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লগিল।

অকস্মাৎ তাহার পরীর কথা মনে পড়িয়া গেল। মৃত্যুর দিন সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, রূপ একদিন আমারও ছিল। সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল, এ পরীর বেদনার বিলাপ। কিন্তু আজ এই মূহুর্ত্তে মনে হইল, পরী তাহাকে অভিশাপই দিয়া গিয়াছে।

শুনছ ?

ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রঞ্জন তাহাকে ডাকিল। অশ্রুর লজ্জায় কমল মুখ ফিরাইতে পারিল না, সে নীরবেই পড়িয়া রহিল।

রঞ্জন বলিল, আমাকে আজ এখুনি আবার যেতে হবে। দিন তিনেক হবে, বুঝলে ?

তারপর সব নীরব। রঞ্জন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে নাই, তখনই চলিয়া গিয়াছে। কমল উদাস নেত্রে খোলা জানালার দিকে চাহিয়া পড়িয়া ছিল। মনের মধ্যে সে শুধু ভাবিতেছিল—সেই লঙ্কা ? কেন এত অবহেলা তাহার ? হঠাৎ সে উঠিয়া বসিল, রঞ্জনের কথাগুলা তাহার মনে পড়িয়া গেল, "আয়নায় কি মুখ দেখ না ?" সে ব্যস্ত হইয়া কুলুঙ্গি হইতে আয়নাখানা পাড়িয়া আপনার মুখের সামনে ধরিল। প্রতিবিম্বের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বাস্তব আজ তাহার চোখে পড়িল। কালের সঙ্গে সঙ্গে তিলে তিলে তাহার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা চোখে পড়ে নাই এতদিন, আজ পড়িল ;—সত্যই তো, কোথায় সেই প্রাণ-মাতানো রূপ তাহার ? সেই চাঁপার কলির মত রঙ এখনও আছে, কিন্তু সে চিক্কণতা তো আর নাই। চাঁদের ফালির মত সেই কপালখানি আকারে চাঁদের ফালির মতই আছে, কিন্তু তাহাতে যেন গ্রহণ লাগিয়াছে, সে মসৃণ স্বচ্ছতা আর তাহাতে নাই। গালে সে টোলটি এখনও পড়ে, কিন্তু তাহার আশেপাশে সূক্ষ্ম হইলেও সারি দিয়া রেখা পড়িতে শুরু করিয়াছে—এক দুই তিন। নাকের ডগায় কালো মেচেতার রেশ দেখা দিয়াছে। সেই সে, সেই সব, কিন্তু সে নবীন লাবণ্য তাহার আর নাই। এই দীর্ঘ দিনে পৃথিবীর ধূলা মাটি তাহাকে ম্লান করিয়াছে। তাড়াতাড়ি সে আয়নাটা বন্ধ করিয়া দিল। আবার তাহার

কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। রঞ্জনের অবহেলার জন্য নয়, তাহার রূপের জন্য কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কয় ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া পড়িয়া মাটির বুকে মিশিয়া গেল।

থাকিতে থাকিতে বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়িয়া গেল আর একজনের কথা। বৃদ্ধ রসিকদাস—বগ-বাবাজীর মুখ বহু দিন পরে তাহার চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। সেই কৌতুকোজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখ। কমলের মনে হইল, মহান্ত ব্যঙ্গভরে হাসিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত অন্তর তাহার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, না না না। সে তাহাকে বলিত, কৃষ্ণপূজার কমল। সেই তাহার নাম দিয়াছে—রাই-কমল। কমল শুকায়, কিন্তু রাই-কমল, সে তো কখনও শুকায় না। আবার সে শিহরিয়া উঠিল, মনে পড়িল পরীকে। পরী ব্যঙ্গভরে হাসিতেছে যেন—সেই জীর্ণ শীর্ণ বীভৎস মরণাতুর মুখ।

তেরো

ইহার কয়দিন পর। আকাশ তখনও মেঘলা হইয়া আছে। অপরাহ্নের দিকে কমল বিগ্রহ-মন্দিরের দাওয়ার উপর বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। রঞ্জন সেই গিয়াছে, আজও ফেরে নাই। সে যেন কমলকে লুকাইয়া একটা কিছু করিতেছে। কমলও কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নাই। মনের মধ্যে একটি অভিমানাহত উদাসীনতা তাহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। সে আপনার মনে মৃদুস্বরে গাহিতেছিল—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

বাহিরের আগড় ঠেলিয়া কে যেন প্রবেশ করিল। কমল চাহিয়া দেখিল, সে রঞ্জন। রঞ্জনের বেশে আজ পরম পারিপাট্য ছিল। কপালে চন্দনের তিলক, গলায় ফুলের মালা, পরনে রেশমী বহির্বাস, গলায় উত্তরীয়। কমল মুগ্ধ হইয়া গেল। রঞ্জন কিশোর সাজিয়া তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল! সে সব ভুলিয়া গেল এক মুহূর্ত্তে। সব ভুলিয়া গিয়া সে হাতের মালাগাছি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হউক দেবতার নামে গাঁথা মালা। সেও আজ কিশোরী সাজিবে।

হাসিমুখে কাছে আসিয়া সে বলিল, এ কি, এ যে নটবর বেশ! দুই হাত তুলিয়া রঞ্জনের গলায় মালা দিতে গেল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিশ্চল হইয়া গেল সে, আর্ত্তস্বরে প্রশ্ন করিল, ও কে মহান্ত?

মহান্তের পিছনে ঠিক দরজার মুখে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

মেয়েটি শ্যামাঙ্গী, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গব্যাপী একটি চটুলতায় সে মনোহারিণী। তাহার সে চটুল রূপ ষোল কলায় পূর্ণবিকশিত। রঞ্জনকে উত্তর দিতে হইল না। মেয়েটি বাড়ি ঢুকিল, অদ্ভুত চপলা মেয়ে, দেখিলেই তাহার প্রকৃতি বুঝা যায়; সর্ব্বাঙ্গে একটি হিল্লোল তুলিয়া হাসিতে হাসিতে সেই বলিল, আমি নতুন সেবাদাসী গো।

তারপর একটু আগাইয়া আসিয়া সে আবার বলিল, তুমিই বুঝি কমল বোষ্টমী—রাই-কমল ? তবে যে শুনেছিলাম, গাইয়ে-বাজিয়ে বলিয়ে-কহিয়ে—রূপে মরি-মরি ! ও হরি, তুমি এই !

ঠোঁটের আগায় সে একটা পিচ কাটিয়া দিল। ধীরে ধীরে কমল মুখ তুলিল, কিছুক্ষণ রঞ্জনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মুখেও তাহার ফুটিয়া উঠিল বিচিত্র এক হাসি। রঞ্জন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। মেয়েটিও কেমন যেন অভিভূত হইয়া গেল, সে দৃষ্টির সম্মুখে। কমল এইবার কথা বলিল, হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আমিই রাই-কমল। এখন এস, মহান্তকে পাশে নিয়ে দাঁড়াও দেখি—বরণ ক'রে ঘরে তুলি ; দাঁড়াও, পিঁড়িখানা নিয়ে আসি।

ঝুলনের জন্য আলপনা-আঁকা পিঁড়িখানা আনিয়া সে পাতিয়া দিল। সেদিনের সে আলপনা আজও ঝকঝক করিতেছে, দুইজনের জন্য দুই পাশে দুইটি পদ্ম। দেব-মন্দির হইতে শঙ্খঘণ্টা বাহির করিয়া আনিল, জল ভরিয়া ঘট পাতিয়া দিল, তারপর বলিল, পিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াও।

রঞ্জন বলিল, থাক্।

হাসিয়া কমল বলিল, এ যে করণীয় কাজ গো। ছিঃ, উঠে দাঁড়াও, আমি বরণ করি।

সন্ধ্যায় সে নিজের হাতে ফুলশয্যা সাজাইয়া দিল। আপনি শুইতে গেল, পরী যে ঘরে মরিয়াছিল সেই ঘরে।

পরদিন সকালে উঠিয়া কমল স্নান করিয়া দেবতার ঘরে ঢুকিয়া বসিল, অনেকক্ষণ পর ঘর হইতে বাহির হইয়া রঞ্জন ও নূতন বৈষ্ণবীর বাসর-দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা খোলা, উঁকি মারিয়া দেখিল, রঞ্জন শুইয়া নাই। এদিক ওদিক সে খুঁজিয়া দেখিল। না, রঞ্জন বাড়িতে নাই। কমল অগত্যা পরীর ঘরেই বসিয়া রহিল। ও ঘরে তরুণীটি এখনও ঘুমাইতেছে।

কিছুক্ষণ পর রঞ্জন ফিরিল। কমলকে দেখিয়া সে লজ্জিত হইল, ব্যস্ত হইয়া বলিল, কি বিপদ, রাখালটা আসে নাই। সে তাহাকে আড়াল দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। হাসিয়া কমল ডাকিল, লঙ্কা! দীর্ঘকাল পর সে রঞ্জনকে 'লঙ্কা' বলিয়া ডাকিল। এতদিন হয় 'ওগো' বলিয়াছে অথবা 'মহান্ত'।

রঞ্জন নতমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল হাসিয়া কহিল, এমন লুকিয়ে ফিরছ কেন বল তো?

নতচক্ষেই রঞ্জন বলিল, আমায় মাপ কর কমল।

প্রশান্ত কণ্ঠে কমল উত্তর দিল, আর 'কমল' নয়, 'চিনি' বল। বহুকাল পরে তুমি আমার লঙ্কা, আমি তোমার চিনি। কিন্তু রাগ কি তোমার ওপর করতে পারি লঙ্কা? রাগ আমি করি নাই।

ব্যগ্রভাবে রঞ্জন বলিল, সত্যি কথা বল কমল।

না না, 'কমল' নয়, 'চিনি' বল।

অগত্যা রঞ্জন বলিল, সত্যি কথা বল চিনি।

কমল হাসিমুখে বলিল, রাগ করি নাই, রাগ করি নাই, রাগ করি নাই—তিনি সত্যি করলাম, হ'ল তো?

রঞ্জন এবার আদর করিয়া কমলকে বুকে টানিয়া লইতে গেল। কিন্তু কমল বেশ মর্য্যাদার সহিত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, ছিঃ! তুমি লঙ্কা, আমি চিনি।

তারপর ঘরের ভিতর হইতে একটা পোঁটলা বাহির করিয়া কাঁখে তুলিয়া লইল বলিল, এইবার আমায় বিদেয় দাও।

সে কি?

হ্যাঁ। আমি যাই।

তবে তুমি যে বললে, আমি রাগ করি নাই?

না, রাগ আমি করি নাই। তবে—তবে, পরীর কথা মনে পড়ে তোমার—যেদিন আমি প্রথম আসি? আমার এই ভ্রূর পানে তাকিয়ে দেখ, মনে পড়বে।

রঞ্জন নীরবে কমলের মুখে দিকে চাহিয়া রহিল। কমল আবার বলিল, আমিও তো সেই পরীর জাত, আমার বুকে তো মেয়ের পরান আছে লঙ্কা। সে সেই আশ্চর্য্য হাসি হাসিল।

রঞ্জন কমলের হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিল, না না কমল, এ রাজত্ব তোমারই। ও তোমার দাসী হয়ে থাকবে। তুমি তো জান, বৈষ্ণবের সাধনা—রাধারাণীর কল্পনা—যৌবন-রূপ—

বাধা দিয়া কমল বলিল, ওরে বাপ রে! অনেক এগিয়েছ তুমি। তা বটে, যৌবন-রূপ সামনে না থাকলে ধ্যান-ধারনায় বাধা পড়ে, রূপ-রসের উপলব্ধি হয় না, মনে রাধারাণী ধরা পড়েন না। ঠিক কথা। একটু হাসিয়া আবার বলিল, তুমি

আমার গুরু গো। তোমার সাধন-পথেই তো যাচ্ছি আমি। আমিও তো বৈষ্ণবী, আমারও তো চাই একটি শ্যাম-কিশোর।

রঞ্জন নির্ব্বাক হইয়া গেল। কমল দুয়ারের কাছে গিয়াছে, তখন সে বলিয়া উঠিল, বলি, তারই সন্ধানে চললে বুঝি ?

কমল রঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ গো, তারই সন্ধানে চলেছি আমি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

সে হাসিতে, সে স্বরে ব্যঙ্গ নাই, শ্লেষ নাই, ব্যথা নাই; বিচিত্র সে হাসি—বিচিত্র সে কলস্বর !

কমল পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথ—অজয়ের কূলে কূলে পথ। ঘাট, মাঠ, মাঠের পর গ্রাম। গ্রামের মধ্যে পথের দুই পাশে গৃহস্থের দুয়ার।

বৈষ্ণবী পথের পর পথ পিছনে ফেলিয়া চলে। গৃহস্থের দ্বারে গান গাহিয়া ভিক্ষা চায় বিনীত হাসিমুখে। ভিক্ষা লয় সন্তোষের আশীর্ব্বাদে গৃহস্থের ভিক্ষা-দেওয়া শূন্য পাত্রখানি ভরিয়া দিয়া। পরিতুষ্ট পুরনারীরা ভিক্ষা দিয়া নিমন্ত্রণ করে, আবার এসো বোষ্টমী।

হাসিয়া বৈষ্ণবী বলে, তোমাদের দুয়ারই যে আমাদের ভাণ্ডার, আসব বইকি।

হাটে-বাজারে বৈষ্ণবী গান গায়। রসিক শ্রোতার দল নানা প্রশ্ন করে। বৈষ্ণবী মিষ্ট হাসি হাসিয়া অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দেয়। শ্রোতারা হাসিয়া বলে, বোষ্টমীর গান যেমন মিষ্টি, হাসিও তেমনই মিষ্টি।